# রাজ-রাণী।

( সত্যঘটনামূলক উপন্যাস )


প্রিয়তমার পত্র, রাজকুমার, বিলাস-ভাণ্ডার প্রভৃতি

গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।



কলিকাতা,

নং বীডন স্কোয়ার "নূতন কলিকাতা-যন্ত্রে"

শ্রীপরমসুখ সাহা দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

১২৯৮ সাল

# উৎসর্গ-পত্র।

আমার বাল্যবন্ধু

জীবনের সহচর

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসুর

পবিত্র নামে

এই

ক্ষুদ্র পুস্তক খানি

উৎসর্গ করিলাম।

কলিকাতা।
সন ১২৯৮ সাল
মাঘ।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
তারাগুনিয়া।

# রাজ-রাণী।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### আনন্দোৎসব।

মহারাজ চন্দ্রকেতুর নবকুমারের শুভ অন্নপ্রাশন। রাজবাটীতে আজ বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। নৃত্য, গীত বাদ্যে প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, নানাবিধ বর্ণের পতাকা কুসুম-হারে সজ্জিত, নানাবিধ গন্ধদ্রব্যে আমোদিত। এখনও সন্ধ্যা হয় নাই, এখনও অস্তগামী সূর্য্যের অন্তিম কিরণ-ছটা পশ্চিম গগন আলোকিত করিয়া রহিয়াছে! অনন্ত নীল গগনে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ বসন্ত সমীরণে ইতঃস্তত সঞ্চালিত হইতেছে, তাহাতে সেই অস্তগামী সূর্য্যের রক্ত কিরণ-রাশি পতিত হইয়া গগনের অপূর্ব্ব শোভা সৃষ্টি করিয়াছে। কোথাও নীল, তাহার পার্শ্বে সূর্য্য-কিরণ প্রবিষ্ট সেই লোহিত মেঘমালা; তাহার পার্শ্বে ধূসর, আবার তাহার পার্শ্বে নীল, লোহিত, ধূসর [এইরূপ স্তরে স্তরে —যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর, কেবল সেই নয়ন-মন-বিমুগ্ধকর স্বভাবের অপূর্ব্ব শোভা!

ক্রমে রক্তিমচ্ছটা অন্তর্হিত হইল, কুসুম-ভূষণে বিভূষিতা সন্ধ্যা-সতী ধীরে ধীরে অবনীতে আগমন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা-সমীরণে গোলাপ, মল্লিকা, যাতি, যূঁথি, গন্ধরাজ প্রভৃতি কুসুম-কুল প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে চারিদিক আমোদিত করিল। গগনে কোটী কোটি তারকা-রাজি কোটী চক্ষু মেলিয়া বসন্তের সেই অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিল। নবকিশলয়-শোভিত বৃক্ষোপরি বসিয়া বসন্তদূত কোকিল কুহুরবে জগৎ মাতাইতে লাগিল।

সন্ধ্যা-সমাগমে রাজ-প্রাসাদে আলোক জ্বলিত, দুর্গ-প্রাকার হইতে অনবরত তোপধ্বনি হইতে লাগিল, ধীর মলয়-সমীরে সে তোপধ্বনি কতদূরে প্রবাহিত হইয়া, রাজ-আনন্দের সংবাদ প্রচার করিতে লাগিল। দলে দলে লোক সকল রাজবাটী-অভিমুখে চলিয়াছে, আজ সকলেই আনন্দিত, সকলেরই বদনে হর্ষের চিহ্ন;—সকলেই উৎসবে মত্ত, নিরন্তর জনস্রোত রাজ প্রাসাদ পরিপূর্ণ করিতেছে। এই আনন্দ-সাগরের মধ্যে একজন কেবল নিরানন্দে ভাসিতেছে—সে একজন ফকির।

চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ মাঠ, তাহার মধ্যস্থলে রাজ-প্রাসাদ, প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে গড়খাই করা, তাহার ভিতরেই দুর্গ।

সেই প্রান্তরে একজন ফকির বসিয়া আছে। ক্রমে রজনী গভীরা হইল, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইল, নিদ্রার শান্তিময়ী ক্রোড়ে সকলেই বিশ্রাম লাভ করিল, কেবল রাজপ্রাসাদের বহু কণ্ঠের আনন্দধ্বনি সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। ফকিরের প্রাণে তাহা সহিতেছিল না।

সেই জনশূন্য প্রান্তর-মধ্যে ফকির একাকী উপবিষ্ট। তাহার

নয়ন জ্বলিতেছিল, গগনে যে তারকা জ্বলিতেছে, তাহা অপেক্ষায় তাহার নয়নের দীপ্তি অধিক। তাহার বদন আরক্তিম, নিরন্তর দন্তে দন্তে ঘর্ষণ হইতেছে। সেই জ্বলন্ত নয়নে রাজপ্রাসাদের দিকে চাহিয়া ফকির আপন মনে কহিতেছিল ;—

"চন্দ্রকেতু !—আমাকে অবজ্ঞা, আমার অপমান, ভেক হইয়া সর্পকে লাঞ্ছনা করিবার ইচ্ছা ! পামর, আমার কোপানলে তুই ছার খার হইবি। পুত্রের—বংশধরের অন্নপ্রাশন !—বড় আনন্দ ;—কিন্তু বংশ কি থাকিবে ? যে রাজপদের গৌরবে আজ তুই আমাকে অপমানিত করিয়াছিস্, সে রাজপদ তোর ঘুচিবে ; সে অভিমান, সে দর্প চূর্ণ করিব। যে বংশধরের অন্নপ্রাশনে আজ তুই উল্লসিত,—যার প্রফুল্ল-বদন দেখিয়া আজ তুই আনন্দে ভাসিতেছিস্, সে বংশধর তোর থাকিবে না, তোর বংশ ধ্বংস করিব, তোর জীবন সংহার করিব, তোর উন্নত অট্টালিকা ধূলিসাৎ করিব, তবে আমার এ ক্ষোভ যাইবে, এ হৃদয়াগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে।"

ফকির নিস্তব্ধ হইল। তাহার জ্বলন্ত নয়ন আরও জ্বলিয়া উঠিল, তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, সেই স্ফুলিঙ্গ প্রান্তরপার হইয়া যেন রাজ-প্রাসাদ ভস্ম করিতে ছুটিল !

অকস্মাৎ কোথা হইতে—"কুল্ কুল্"—শব্দ হইল, ফকির তাহা শুনিতে পাইল। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া, সেই গভীর রাত্রে সেই জনশূন্য প্রান্তরের মধ্য দিয়া ফকির উন্মাদের ন্যায় ছুটিল।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## গঙ্গা-দেবী।

ফকির ছুটিতেছে, ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই, তীরের ন্যায় মাঠ দিয়া সেই "কুল কুল"—শব্দ লক্ষ্য করিয়া ফকির ছুটিতেছে। প্রায় দুই ক্রোশের উপর পথ আসিলে, ফকির দেখিল, প্রভূত সলিল-রাশি প্রান্তর প্লাবিত করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, সলিলের বেগও থামিল।

অকস্মাৎ সলিলাভ্যন্তর হইতে একটী রমণী উত্থিতা হইলেন। তাঁহার অনুপম রূপরাশি, মনোহর বদনে স্বর্গীয় প্রভা বিরাজিত; ‘বিবিধ ভূষণে বিভূষিত, চরণদ্বয়ে অলক্ত রঞ্জিত, তাহা হইতে মকরন্দ গন্ধ ছাড়িতেছে! সেই অসীমরূপসম্পন্না দেবীকে ফকির চিনিল এবং ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কহিল,—

"মা গঙ্গে, আপনি কোথায় যাইতেছেন?"

গঙ্গা। চন্দ্রকেতু রাজার বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ আছে সেই-খানে যাইতেছি।

ফকির। তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাশন-উপলক্ষে?

গঙ্গা। হাঁ—

ফকির। আপনি বৃথায় যাইতেছেন?

গঙ্গা। কেন?

ফকির। অন্নপ্রাশন যে কল্য হইয়া গিয়াছে।

গঙ্গা। অন্নপ্রাশন হইয়া গিয়াছে?

ফকির। আজ্ঞা হাঁ—

গঙ্গা। তুমি ঠিক্ জান?

ফকির। আমি কি মিথ্যা কহিতেছি, আমিও যে সেইখান হইতে বিদায় হইয়া আসিয়াছি।

গঙ্গা। তবে আমি আর যাইব না, কিন্তু এক ভাবনায় পড়িলাম।

ফকির। কি ভাবনা?

গঙ্গা। চন্দ্রকেতুর পুত্রের জন্য আমি যে যৌতুক আনিয়াছি, তাহার কি করি; কেমন করিয়া পাঠাই?

ফকির। তার জন্য চিন্তা কি, আমার নিকট দিন, আমি গিয়া দিয়া আসিব।

গঙ্গা। তুমি কে?

ফকির। আমি?—আমি সামান্য ফকির।

গঙ্গা। না,—তুমি ফকির বটে,—কিন্তু সামান্য নয়;—সামান্য ফকির—সে মানব, মানবে আমায় কেমন করিয়া দেখিতে পাইবে?

ফকির। চন্দ্রকেতু কি?—সেও ত মানব।

গঙ্গা। মানব বটে, লোকের চক্ষে,—কিন্তু চন্দ্রকেতু শাপভ্রষ্ট, উহাতে দেবভাব আছে।

ফকির। সে কেমন?

গঙ্গা। সে পরিচয় এখন দিবার সময় নহে, সে অনেক কথা। রাত্র প্রভাত হয়, রজনী থাকিতে আমি প্রস্থান করিব। এখন তুমি কে, শীঘ্র বল?

ফকির। আমি কে দেখুন।

গঙ্গাদেবী মুখ তুলিয়া চাহিলেন; দেখিলেন,—জটাজুটধারী উত্তম কান্তিবিশিষ্ট দিব্য পুরুষ মূর্ত্তি। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার নামটি কি শুনিতে পাই না?"

ফকির। আমার নাম গোরাচাঁদ।

গঙ্গা। আপনি মুসলমান?

ফকির! স্বর্গে হিন্দু মুসলমান আছে?

গঙ্গা আর কোনও কথা কহিলেন না, চন্দ্রকেতুর পুত্রের যৌতুক তাঁহার হস্তে দিয়া প্রস্থান করিলেন। গোরাচাঁদ উঠিয়া যাইলেন।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

---

## দেবগঙ্গা।

রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতে সকলে আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিল, যেখানে কাল মাঠ দেখিয়াছিল, কাল যাহার উপর রাখালগণ গরু চরাইয়াছিল, আজ তাহার মধ্যে কিনা গভীর তীব্রবেগ-শালিনী নদী প্রবাহিতা হইতেছে! এই অদ্ভুত ব্যাপার ক্রমে চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া পড়িল, দলে দলে লোক আসিয়া নদীর তীরে জড় হইতে লাগিল।

এ সংবাদ রাজবাড়ী গিয়া পৌঁছিল, চন্দ্রকেতু এই অদ্ভুত

কথা শুনিলেন, শুনিবামাত্র অশ্বারোহণে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন।

রাজ-ভবন হইতে অন্যূন দুই ক্রোশ পথ আসিলে, তিনি নদী ও লোকসমূহ দেখিতে পাইলেন। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণ, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

নদীর স্বচ্ছসলিলে বসন্তবায়ু-বিতাড়িত তরঙ্গ-সমূহ মৃদুভাবে বেলা ভূমিতে আসিয়া আঘাত করিতেছে, আবার প্রতিঘাতে নাচিয়া নাচিয়া ফিরিয়া যাইতেছে, ডুবিতেছে, ভাসিতেছে, ছুটিতেছে;—ছুটিতে ছুটিতে আবার তীরে আসিয়া লাগিতেছে। রাজা চন্দ্রকেতু দাঁড়াইয়া সেই তরঙ্গ-ক্রীড়া দেখিতেছিলেন। তরঙ্গকুল কুল-কুল রবে চন্দ্রকেতুকে কি বলিয়া গেল, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মস্তক ঘুরিল, তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া নদী-তীরের সেই বালুকারাশির উপর পতিত হইলেন।

জন-স্রোতে মহা কলরব উঠিল। রাজাকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া সকলেই তাঁহার সাহায্যার্থে ছুটিল; নিমেষ-মধ্যে রাজ-প্রসাদে সমাচার পৌঁছিল, সেখান হইতে রাজ-আত্মীয়গণ ছুটিয়া আসিলেন। মূর্চ্ছিত—বালুকা-বিলুণ্ঠিত রাজ-কলেবর, ধীরে ধীরে উপরে উঠাইয়া, নদীর স্বচ্ছ শীতল বারি তাহার বদনমণ্ডলে প্রদান করা হইল, কত লোক বস্ত্র দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। জনতা নিস্তব্ধ,—একাগ্রচিত্ত, রাজার পীড়ায় সকলেই ম্রিয়মাণ।

ক্রমে রাজার চৈতন্যোদয় হইল, ধীরে ধীরে মুদ্রিত নয়নযুগল উন্মীলিত হইল, তিনি একবার বিস্মিতনেত্রে পার্শ্বস্থিত

ব্যক্তিগণকে দেখিলেন। তাঁহার নয়নপথে আবার সেই কৃষ্ণকায়া নদী পতিত হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে আবার সেই নদী-তীরে উপস্থিত হইলেন। অবাক; সেই উত্তাল তরঙ্গ-ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের শোক পুনরায় উথলিয়া, উঠিল, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ রাজার এইরূপ কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল. গূঢ়তত্ব জানিতে না পারিয়া একদৃষ্টে রাজার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর, তিনি উচ্চৈঃস্বরে সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"তোমরা সকলে অকস্মাৎ এই নদী দেখিয়া অবশ্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ, আশ্চর্য্যান্বিত হইবারও কথা বটে, কিন্তু ইহার বৃত্তান্ত কেহই অবগত নহ, জানিবার উপায়ও নাই। আমি ইহার কারণ জানি, বলিতেছি শুন।"

এই বলিয়া চন্দ্রকেতু কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইলেন, উপস্থিত সকলে রহস্য জানিবার জন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল:—তিনি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"শুন, কি জন্য রাজ্যের মধ্যে এখানে নদী হইল। আমার পুত্রের অন্নপ্রাশন-উপলক্ষে আমি যেমন আত্মীয়বন্ধুগণ ও প্রজাগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তদ্রূপ আমি গঙ্গাদেবীকেও নিমন্ত্রণ করি। কথাটা অসম্ভব বটে; কারণ, গঙ্গা দেবী, মনুষ্য হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা, এটা আশ্চর্য্য এবং বলিলেও লোকে বাতুল বিবেচনা করিবে। কিন্তু, যথার্থই আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। আমার বংশের মধ্যে, একটি গুপ্ত রহস্য আছে, সেই জন্য দেবতার মধ্যে কেবল গঙ্গাদেবীকে আমরা দেখিতে

এবং তাঁহার সহিত কথোকথন করিতে পাই এবং তিনিও আমার বাটী আসিয়া আমাদিগকে দেখা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেই কারণেই আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম এবং তিনিও আসিয়াছিলেন। কিন্তু কি জন্য যে তিনি এই স্থান হইতে ফিরিয়া গেলেন, তাহার কারণ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় আমার কোনও অপরাধ হইয়াছে, তাই কলুষ-নাশিনী গঙ্গা আমার পাপপুরে পদার্পণ করিলেন না।”

তখন তিনি করযোড়ে গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“মা! পতিতোদ্ধারিণী ভীষ্মজননী গঙ্গে?—মা! এ অধমের বাটীতে পদার্পণ করিলে না কেন মা!—মাগো!—একবার এস মা, আমি তোমার সেই মুক্তিপদদায়িনী রাঙ্গা চরণ দু'খানি দেখিয়া আমার এ মানব-জন্ম সফল করি। মা, আর কি তুমি আসিবে না;—এস মা—আর এক বার এস, তোমার এই অধম সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। মাগো! যদি দয়া ক'রে এসেছিলে; তবে আবার ফিরে গেলে কেন মা?”

চন্দ্রকেতু কাঁদিতে লাগিলেন, পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিয়া উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“এখানে দেশের গণ্য-মান্য ব্যক্তি এবং জনসাধারণ সকলেই উপস্থিত আছ, সকলকে আমি বলিতেছি শুনিয়া রাখ, অদ্যাবধি এই স্থানের নাম ‘দেবগঙ্গা’ রহিল।”

এই বলিয়া চন্দ্রকেতু অশ্বারোহণে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে জনতাও ভাঙ্গিয়া গেল। এখন সেই “দেবগঙ্গা” বর্ত্তমান, কিন্তু সে নদী নাই, কেবল খাদ আছে, গ্রীষ্মে জলশূন্য হয় এবং বর্ষা-বারিতে তাহা পূর্ণ হয়। তখন তাহাতে কমল ফোটে, কত

অলি জোটে, কত রাজহংস নিরন্তর তাহাতে সাঁতার দেয়। বর্ষায় সেই পূর্ব্বদৃশ্য যেন ফিরিয়া আইসে। সেই "দেবগঙ্গা" এখন "দেগঙ্গা" নামে অভিহিত। সেখানে রাহিদিগের একটি আড্ডা আছে। সেখানে সবাই আছে, পোষ্ট আফিষ আছে, একটি আউট পোষ্ট থানা আছে, সেখানে অনেক ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়, যাতায়াতে কোনও কষ্ট নাই।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## প্রতিহিংসার উত্তেজনা।

সেই দিবস সন্ধার পর, যখন রাজ-বাটীর সকলেই উৎসবে উন্মত্ত, কেবল রাজা চন্দ্রকেতু বিষণ্ণচিত্তে একাকী গড়ের বাহিরের ময়দানে ইতঃস্তত পদচারণা করিতেছেন। তাঁহার সে প্রফুল্ল বদন মলিন, প্রশস্ত ললাটে বিশাল চিন্তার রেখা, মনঃ অস্থির ও চিন্তাযুক্ত। তিনি অন্যমনস্কভাবে পদাচারণা করিতে করিতে রাজপ্রাসাদের একটু দূরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন রজনী একটু গভীরা হইয়াছে, প্রান্তর জনশূন্য, চতুর্দ্দিকে নিশীথের গাঢ় কালিমা ছায়া, আর ঝিঁঝি-পোকার অবিরাম সঙ্গীত শ্রবণগোচর হইতেছে।

এমন সময় একটি মনুষ্য মূর্ত্তি রাজ সম্মুখে উপস্থিত হইল। চন্দ্রকেতু অন্যমনস্ক ছিলেন, আগন্তুককে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—

—"কে তুমি ?"

আগন্তুক উত্তর করিল,—"আমি একজন ফকির।"

চন্দ্রকেতু আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আপন প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ফকির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—

"মহারাজ! আমার একটি নিবেদন আছে।"

চন্দ্রকেতু ফিরিলেন, কহিলেন,—

"কি, বল!"

ফকির কহিল—"একটি স্ত্রীলোক আমাকে এই কয়খানি অলঙ্কার দিয়া কহিলেন,—তুমি মহারাজ চন্দ্রকেতুর হস্তে এইগুলি দিয়া কহিবে যে, তিনি আমাকে তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি বোধ হয় যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিতে পারি নাই, অদ্য আসিতে আসিতে পথিমধ্যে শুনিলাম যে তাহার পুত্রের অন্নপ্রাশন হইয়া গিয়াছে; সুতরাং লজ্জায় আমি আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না, আমি এখান হইতে বিদায় হইলাম। এই বলিয়া তিনি আমার হস্তে এই অলঙ্কার কয়খানি দিয়া প্রস্থান করিলেন।"

চন্দ্রকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"রমণীর আকার কিরূপ ?"

ফকির উত্তর করিল,—"মহাশয়, প্রথমে তাঁহার চরণদ্বয় দেখিয়াছিলাম, তাহা রক্তপঙ্কজের ন্যায় আরক্ত। সেই রক্তিম ছটা, রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া মৃত্তিকা আলোকিত করিতেছিল, তাঁহার বর্ণ শ্বেত, মুখশ্রী অতি মনোহর, পরিধানে

একখানি বহুমূল্য পট্টবস্ত্র, অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার। বলিতে কি, মহারাজ, এমন সুন্দরী রমণী জনমে কখনও দেখি নাই ; আমার বোধ হইল—তিনি কোনও দেবী।”

চন্দ্রকেতু অন্যমনে কহিলেন,—“দেবতাই বটে, আমি অধম—মহাপাপী, তাঁহার চরণ দর্শন পাইলাম না, ফকির! তোমার জন্ম সফল, তুমি দেবীকে দেখিয়াছ ;—তোমার নাম কি ?”

ফকির উত্তর করিল—“আমার নাম গোরাচাঁদ।”

চন্দ্রকেতুকে যেন সর্পে দংশন করিল, তিনি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—“কোন্ গোরাচাঁদ ?”

ফকির তীব্রভাবে কহিল—

“যে গোরাচাঁদকে তুমি অপমান করিয়াছ ?”

চন্দ্রকেতুর পূর্ব্বভাব তিরোহিত হইল, ক্রোধে তাঁহার বদন আরক্তিম হইল, নয়ন হইতে অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল, তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে গোরাচাঁদের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—

“তুই কি গঙ্গাকে বিদায় করিয়া দিয়াছিস্ ?”

গোরাচাঁদ অম্লানবদনে উত্তর করিল—

“হাঁ আমিই তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছি।”

চন্দ্রকেতুর বদন আরক্তিম হইল, ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, জ্বলন্ত নয়ন আরও জ্বলিয়া উঠিল, তিনি কর্কশ স্বরে কহিলেন,—“আমার সঙ্গে তোর কিসের বিসম্বাদ, তুই আমার শত্রুতা করিতেছিস্ কেন ?”

গোরাচাঁদ নির্ভয়হৃদয়ে উত্তর করিল—“কেন করিতেছি, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছ ?—তুমি আপনার মনে ভাবিয়া দেখিলেই ত জানিতে পার। তুমি আমার কি অপমান না

করিয়াছ. রাজভোগে উন্মত্ত হইয়া আমাকে অগ্রাহ্য করিয়াছ, কিন্তু তুমি স্থির জানিও, যে পদ-গরিমায় তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছ, তোমার সে পদ, সে ঐশ্বর্য্য, সে মান কিছুই থাকিবে না;—তোমার উন্নত অট্টালিকা ধূলিসাৎ হইবে, তোমার ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইবে, তোমার বংশে বাতি দিতে কেহ থাকিবে না, তোমার পরিখা-বেষ্টিত দুর্গ জনশূন্য হইয়া হিংস্র জন্তুর আবাস হইবে;—তুমি দেখিবে আমার অবমাননার ফল কি?—যদি নিজের মঙ্গল চাও, এখনও আমার সহিত সখ্যতা কর।"

চন্দ্রকেতু বিকট হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন,—

—"সখ্যতা!—তোমার সহিত! ম্লেচ্ছ, বিধর্ম্মী যবন তুই,—তোর সহিত আবার সখ্যতা কি?—তোর যত ক্ষমতা থাকিবে, তুই তাহা দেখাইতে ত্রুটি করিস্ না, আমার রাজত্ব যা'ক,—প্রাণ যা'ক্,—আমি নির্ব্বংশই হই, এ অট্টালিকা ধূলিসাৎ হউক; আমার কিছুতেই ক্ষতি নাই;—প্রাণ থাকিতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মে কালি দিয়া যবনের সহিত সখ্যতা করিতে পারিব না। তোর ক্ষমতা যাহাই থাক্,—কিন্তু আমার ক্ষমতা কাল তোকে দেখাইব, আমার রাজত্বমধ্যে যত মুসলমান আছে, কাল আমি সকলকে বিনষ্ট করিব, পিতার সম্মুখে পুত্রের মস্তক কাটিব,—কাল সন্ধ্যার সময় যবন-বংশে বাতি দিতে কেহই থাকিবে না। বড়ই ক্ষমতা তোর! কাল তুই তাহাদিগকে রক্ষা করিস্। যে আশায় নৈরাশ করিয়া আজ আমার হৃদয়ে আগুণ জ্বালিয়াছে, কাল যবন-শোণিতে তাহার শান্তি করিব।"

চন্দ্রকেতু আর দাঁড়াইলেন না, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

গোরাচাঁদ সেইখানে দাঁড়াইয়া রাজার সেই সগর্ব্ব পদবিক্ষেপ দেখিয়া আপন মনে কহিতে লাগিল,—

"যদি তোর ঐ গর্ব্ব নষ্ট করিতে পারি, তবে আমার এ কষ্ট নিবারণ হইবে। কিন্তু তোর অসীম ক্ষমতা, আমি নিঃসহায় ফকির আমাদ্বারা তাহার প্রতিশোধ হইবে না, যে তোকে শাসন করিবে, যে তোর দর্প চূর্ণ করিবে, আমি তাহার নিকট চলিলাম; দিল্লীশ্বরের সৈন্য তোর বংশ ধ্বংস করিবে। তুই নির্দ্দোষ যবন-বধ করিয়া আপন পাপের বোঝা ভারি কর।" গোরাচাঁদ তৎপরে করযোড়ে উর্দ্ধে পানে চাহিয়া কহিলেন—

"পরমেশ্বর! অনাথবন্ধু! এই নিঃসহায়—নিরীহ,—যবনগণকে দেখিও,—তাহাদের ধন, প্রাণ, মান রক্ষা করিও দেব;—তোমার কাছে হিন্দুমুসলমান নাই, সকলেই তোমার সৃজিত,—তুমি তাহাদের দেখিও, আমি দিল্লী চলিলাম।

গোরাচাঁদ ক্ষুন্নমনে প্রস্থান করিলেন।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

## প্রতিহিংসা।

রজনী প্রভাত হইল। উষার আলোক আকাশের গায় ফুটিতে না ফুটিতে চন্দ্রকেতুর সৈন্যগণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দলে দলে প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সকলে সমবেত হইলে, চন্দ্রকেতু বাহিরে আসিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,

প্রতিহিংসা-উত্তেজিত নয়ন হইতে অগ্নি-কণা নির্গত হইতেছে! তিনি উপস্থিত হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"আজ তোমাদিগকে আমি যুদ্ধে যাইবার নিমিত্ত সজ্জিত হইতে আদেশ করি নাই, আজ আমার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তোমাদিগকে উৎসব হইতে নিরস্ত করিয়া সমর সাজে সজ্জিত করিয়াছি। তোমরা শুনিয়াছ, যে—"পীর গোরাচাঁদ'—নামে একজন যবন এই স্থানে বাস করে;—পরশ্ব রাত্রে সেই দুরাচার নিশ্চয়ই গঙ্গাদেবীকে পথ হইতে ফিরাইয়া দিয়াছে, তাঁহাকে বলিয়াছে যে, 'আমার পুত্রের অন্নপ্রাসন বহুদিবস হইয়া গিয়াছে'—তার শঠতায় আমি সেই পতিতপাবনীর চরণ দর্শন করিতে বঞ্চিত হইয়াছি;—সেই জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার অধিকার মধ্যে যবন রাখিব না। তোমাদিগকে আদেশ দিতেছি যে, আমার অধিকারে যত যবন আছে, তাহাদের সমূলে বিনাশ কর। পিতার সম্মুখে পুত্রের, স্ত্রীর সম্মুখে স্বামী বধ করিয়া, আমার মন-বাসনা সফল কর। কাহারও ক্রন্দনে কর্ণপাত করিও না, কাহারও কাতরবচনে হৃদয়ে ব্যথা পাইও না। যে ব্যথা আমার হৃদয়ে দিয়াছে, তাহার পরিশোধ দাও। যে তাহাতে বাদী হইবে, তাহাকেও সমূলে ধ্বংস কর, যবনের গৃহে অগ্নিপ্রদান কর, সেই ঘরে সপরিবারে তাহাকে পুরিয়া জীবন্ত দগ্ধ কর, তাহার ধন রত্ন যাহা পাইবে, তাহা দীন দরিদ্র হিন্দুগণকে দাও। যাও, আর বিলম্ব করিও না, সন্ধ্যার সময় আমার রাজ্যে যেন একটি মাত্রও যবন জীবিত দেখিতে না পাই।"

চন্দ্রকেতু নিস্তব্ধ হইলেন, উন্মত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার সৈন্যগণ নিরীহ যবনদিগকে বধ করিতে ছুটিল।

প্রাতঃকাল,—কৃষকগণ কেহ উঠিয়াছে, কেহ বা উঠে নাই। কোনও কৃষকবালার নির্ম্মলচক্ষে তখনও ঘুমের ঘোর আছে, আস্তে আস্তে গোলা ভাঁড়টী হাতে করিয়া পুকুরে জল আনিতে যাইতেছে, এমন সময় উন্মত্ত রাজসৈন্যগণ তাহার বাড়ী আক্রমণ করিল! ভয়ে, বিস্ময়ে তাহার হাত হইতে গোলা ভাঁড় পড়িয়া গেল, সে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকারে সুষুপ্ত পুরুষগণ জাগিয়া উঠিল, কিন্তু বাহিরে আসিতে না আসিতে তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে ধরাশায়ী হইল। কাহারও ঘরে আগুণ জ্বলিল। খড়ের ঘর, শীতকালে শুকাইয়া ঝন্ ঝনে হইয়া আছে, অগ্নি লাগিবামাত্র দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই জ্বলন্ত অনলে,—ভয়ে অৰ্দ্ধমূর্চ্ছিত সেই কৃষক-বালার জীবন্ত দেহ নিক্ষিপ্ত হইল।

কোনও বাড়ীতে জননী সন্তানকে স্তন্যপান করাইতেছে, বড় ছেলেটী খাবারের জন্য ক্রন্দন যুড়িয়াছে; কৃষক তামাক খাইতেছে, তামাক খাইয়া মাঠে কাজ করিতে যাইবে। এমন সময় হঠাৎ শমনের সশস্ত্র চরের ন্যায় সৈন্যগণ তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল; মায়ের কোল হইতে ছেলেকে কাড়িয়া লইল, দুগ্ধপোষ্য বালক ভয়ে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, মাতার কাছে যাইবার জন্য হাত বাড়াইল; কিন্তু হায়!—তাহার ক্রন্দন থামিতে না থামিতে, তাহার সেই কোমল অঙ্গ দুই খণ্ড হইল, দেখিতে দেখিতে জ্যেষ্ঠের জীবনহীন দেহ ভূতলে পড়িল। জননী কাঁদিতে পারিল না, এই আকস্মিক বিপদে

তাহার জ্ঞানলোপ হইয়াছে, অজ্ঞানাবস্থায় চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় একদৃষ্টে সেই পুত্রের শোণিতে রঞ্জিত তরবারির প্রতি চাহিয়া আছে। তরবারি আবার উঠিল, যখন নামিল সেই সঙ্গে কৃষকের রমণীর দেহ ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইল।

এইরূপ অত্যাচার হইতে লাগিল, গৃহের পর গৃহ জ্বলিতে লাগিল, লোকের হাহাকারে গ্রাম পূরিয়া উঠিল; চতুর্দ্দিক অগ্নিময় হইল। রাজা চন্দ্রকেতু নিজ প্রাসাদের উচ্চ শিখরে বসিয়া যবনধ্বংস দেখিতেছিলেন।

ক্রমে গ্রামের পর গ্রাম পুড়িতে লাগিল, গ্রামে গ্রামে যবন ধ্বংস হইতে লাগিল, শোণিতের স্রোত প্রান্তর প্লাবিত করিয়া নদী-অভিমুখে ছুটিল। লোকের হাহাকারে কর্ণপাত করে কে?—সকলেই যবন-বধে উন্মত্ত। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সমস্ত দিন নর-শোণিত দর্শন করিয়া সূর্য্যদেব পশ্চিম সাগরে ডুব দিলেন।

সন্ধ্যার মধ্যে যবন কুল ধ্বংস হইল। হাহাকার থামিল,—কেবল শৃগাল-কুক্কুরের ভীষণ রব শুনা যাইতে লাগিল। নির্ব্বাণোন্মুখ গৃহাগ্নির নিস্তেজ আলোকে মাংসাহারী জীব সকল নরমাংস ভক্ষণ করিতেছে দেখা যাইতে লাগিল। গ্রাম—শ্মশান, প্রজ্বলিত গৃহ সমূহ চিতাগ্নির ন্যায় একে একে নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল।

যখন সমস্ত নিস্তব্ধ হইল, তখন চন্দ্রকেতু প্রাসাদ-শিখর হইতে অবতরণ করিলেন। যখন তিনি নিম্নে অবতরণ করেন, তখন অকস্মাৎ তাহার বাম অঙ্গ কম্পিত হইল, বামনয়ন স্পন্দিত হইল, মস্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িল।

এই অমঙ্গলে চন্দ্রকেতুর বীর হৃদয় বিকম্পিত হইল, কিন্তু

প্রতিশোধের নিমিত্ত, তৎক্ষণাৎ তাহা অন্তর্হিত হইল। তিনি নিম্নে আসিয়া প্রত্যাগত সৈন্যগণকে সান্ত্বনা করিয়া, বিশ্রাম করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### গোরাচাঁদের দিল্লী যাত্রা।

গোরাচাঁদ চন্দ্রকেতুর নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া নিজ আবাসে আসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, সেই রাত্রেই দিল্লী যাত্রা করেন; কিন্তু চন্দ্রকেতু কিরূপ অত্যাচার করে, কিরূপে তাঁহার কার্য্যের প্রতিশোধ দেয়, দেখিয়া যাইবার জন্য তিনি সে দিবস অবস্থান করিলেন।

প্রভাতে যাহা দেখিলেন,—তাহাতে তাঁহার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইল। লোকের হাহাকারে তাঁহার নয়নে জল আসিল; তাঁহার জন্যই তাঁহার স্বজাতিগণের এই দুর্দ্দশা এ কথা ভাবিয়া তাঁহার অন্তর পুড়িতে লাগিল, তিনি প্রতিহিংসার পরিশোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি দিল্লী যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়, চন্দ্রকেতুকে উদ্দেশে কহিলেন,—

"দুর্বৃত্ত! যে পাপ তুই আজ সঞ্চয় করিলি, শত জন্মেও তাহার পরিশোধ হইবে না। নরাধম, যে শোণিতপাত তুই আজ করিলি, তোর শত পরিবারের শোণিতে তাহার কিয়দংশ পরিশোধ হইবে না। রাজভোগ, রাজসম্মান, স্ত্রীপুত্রের মুখ দর্শন, আর

তুই এক মাসের নিমিত্ত করিয়া লও, এ জনমে আর দেখিতে পাইবে না। আমি তোর সর্ব্বনাশের চেষ্টায় চলিলাম।"

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, সে সময় বঙ্গদেশ হইতে দিল্লী যাওয়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। এখন ইংরাজের কৃপায় চব্বিশ ঘণ্টায় যে পথ যাওয়া যায়, তখন তাহা তিন মাস লাগিত। তাও কি পথ ছিল? বন, জঙ্গল, মাঠ, পাহাড় পর্ব্বত, কত নদ নদী অতিক্রম করিয়া, কত দস্যুর হস্ত হইতে জীবন রক্ষা করিয়া তবে পথ চলিতে হইত। কিন্তু সে মনুষ্যের পক্ষে। গোরাচাঁদ ত মানুষ নহেন; যদিও নরাকারে ভ্রমিতেন বটে, কিন্তু তিনি দেব অবতার; যদিচ স্বয়ং ঈশ্বর নহেন, কিন্তু তিনি সেই শক্তিপ্রভাবে তিন মাসের পথ সেই রজনীমধ্যে অতিক্রম করিয়া তিনি প্রভাতে দিল্লী-নগরে উপস্থিত হইলেন। *

ভারতের রাজধানী দিল্লী, তাহার শোভা বর্ণনাতীত! যমুনার পূর্ব্ব তীরে সর্ব্বশোভাময়ী দিল্লী-নগরী। সুরম্য হর্ম্ম্য, বিস্তৃত কানন, অসংখ্য বিপনি, নানাবিধ ব্যক্তি সমূহে নগর পরিপূর্ণ। প্রশস্ত রাজপথ নিরন্তর জনতাপূর্ণ, অবিরত জনস্রোত চলিয়াছে; সকলেই আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত, সকলেই নিজ নিজ গন্তব্যপথে গমন করিতেছে। ইহার অধিবাসীদিগকে দেখিলে, সকলকেই সুখী বলিয়া বোধ হয়, যেন কাহারও কোন অভাব নাই! ঈশ্বর দিল্লীকে যেন সর্ব্বসুখের আকর করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

বাস্তবিক তখন ছিলও তাই। আজকাল যেমন সর্ব্বদাই হাহাকার,—তখন তেমন ছিল না। তখন অন্নাভাবে লোক

* ইহাই লোক প্রচলিত।

মরিত না, তখন বসুন্ধরা শস্যপূর্ণ ছিল, তখন সুবৃষ্টি হইত, বারি অভাবে মাঠে ধান শুকাইয়া যাইত না! তখন এত পীড়া, এত মহামারি হইত না, তখন সকলে সবল ও সুস্থকায় ছিল। এখন আমরা অন্নের জন্য ভাবিয়া আকুল, কাল কি খাইব, আমাদের সে সংস্থান নাই। দুর্ভিক্ষ বিকট মূর্ত্তিতে একবার নহে প্রতিনিয়তই আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অস্থিপঞ্জরধারী আমরা তাহার সেই ভীষণ বেশ দেখিয়া পঞ্জরের মধ্যে যে অন্তরাত্মাটুকু ধুক্‌ ধুক্‌ করিতেছে, তাহা পলাইবার চেষ্টায় আছে। কেন এমন হয়? আগে যাহা ছিল, এখনও ত তাহাই আছে; তবে লোকের এত কষ্ট হয় কেন?—একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই ইহার কারণ বুঝিতে পারা যায়। তখন কৃষক চাষ করিত, ব্যবসায়ী ব্যবসা করিত, তাঁতী তাঁত বুনিত, কর্ম্মকার লোহ পিটিত, স্বর্ণকার অলঙ্কার গড়িত, রজক কাপড় কাচিত, যাহার যে কর্ম্ম সে তাহাই করিত; তাহাতেই তাহাদের দিনপাত হইত, উন্নতিও হইত; তাই তখন বঙ্গদেশ শস্যশালিনী ছিল। ভারতের শিল্প জগদ্বিখ্যাত ছিল, ভারতে যেমন কারুকার্য্য হইত, এমন আর কোথাও হইত না। তখন লোকে অসভ্য ছিল। (আর এখন—এই ঊনবিংশতি শতাব্দীর উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে—লোকের নয়ন ঝলসিয়া গিয়াছে, তাই এখন কেহ চসমা ভিন্ন চলিতে পারেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতে লোকের অসভ্যতা ধুইয়া মার্জ্জিত হইয়াছে, তাই কৃষক লাঙ্গল ফেলিয়া কলম ধরিয়াছে। তাঁতির তাঁত বোনা এখন অসভ্যতা—সে তাহার তোড়জোড় সব লুকাইয়াছে, তাই এখন সে কর্ম্মের মন্ত্র লাগাইত! রজকপুত্র কাপড় ইস্ত্রী করা ভুলিয়া গিয়াছে, সে এখন গ্র্যাযুয়েট

(Graduate); তাহার জন্য উচ্চপদ আবশ্যক! যখন দেশের সকলেই সভ্য, তখন লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করে কে? কাযেই শস্যাভাব, শস্যাভাবে অন্নাভাব,—অন্নাভাবে হাহাকার। ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ আজকাল সভ্যতার এক একটী অঙ্গ বিশেষ।

ধন্য সভ্যতা! তোমার পায়ে কোটী কোটী নমস্কার!—তুমি এমনি করিয়াছ যে, আজ যদি ইংরেজরাজ কাপড় আমদানী বন্ধ করিয়া দেন, কাল এই ভারতের বিংশতি কোটী সভ্য প্রাণী উলঙ্গ!—একি সভ্যতার চূড়ান্ত নয়?—আর চাহি না, হে সভ্যতা!—তুমি অন্তর্হিত হও, আবার আমাদের সেই অসভ্যতা ফিরিয়া আসুক,—চাষার ছেলে, আবার চাষ করুক, তাঁতি তাঁত বুনুক, যাহার যে কর্ম্ম সে তাহাই করুক;—লোকের অভাব মোচন হইবে। ভারত শস্যশালিনী হউক, লোকে সুস্থ ও সবল হউক; বঙ্গের হাহাকার দূর হউক, আমরা একমুষ্টি খাইয়া বাঁচি।)

দিল্লীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে, সেই জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া, গোরাচাঁদ যাইতে লাগিলেন।

ক্রমে রাজ-প্রসাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। বহু দূর বিস্তৃত, সমুন্নত, প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রসাদ; তাহার চতুর্দ্দিকে পরিখা, তাহার উপর উচ্চ প্রাচীর। বৃহৎ সিংহদ্বার, তাহাতে সশস্ত্র প্রহরিগণ দিবারাত্র পাহারা দিতেছে। গোরাচাঁদ সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া, প্রাঙ্গনে পড়িলেন এবং তথা হইতে দরবার-গৃহে উপস্থিত হইলেন।

প্রকাণ্ড শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ, তাহার চতুর্দ্দিকে রক্তবর্ণ মখমল-মণ্ডিত, তাহাতে নানাবিধ কারু-কার্য্য, স্থানে স্থানে

রত্ননির্ম্মিত ঝালর, রজত নির্ম্মিত পরী, তাহাদের হস্তে দীপাধার। গৃহের ছাদেও ঐরূপ রত্নমণ্ডিত, কারুকার্য্য-খচিত রক্তবর্ণ মখমল, তাহাতে নানাবিধ মণি মুক্তা জ্বলিতেছে। গৃহের মধ্যস্থলে একখানি স্বর্ণসিংহাসন, তাহার চারি ধার রেলিং দ্বারা বেষ্টিত।

সেই সিংহাসনে সম্রাট্ বিরাজ করিতেছেন। কিঙ্করগণ চামর ঢুলাইতেছে; পার্শ্বে উজীর প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজ-কর্ম্মচারীগণ যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট। সম্রাট্ বসিয়া বিচার করিতেছেন।

গোরাচাঁদ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, যেখানে সম্রাট বসিয়া বিচার করিতেছিলেন, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দিল্লীশ্বরকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সম্রাট্ এক দৃষ্টে তাঁহার প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মন যেন সন্দিগ্ধ হইল। তিনি আগন্তুকের দেহে যেন কিছু দেবভাব দেখিতে পাইলেন। সম্রাট্ গোরাচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ফকির সাহেব! আপনার কি প্রার্থনা?"

গোরাচাঁদ পুনরায় অভিবাদন করিয়া, করযোড়ে উত্তর করিলেন,—"জাঁহাপনা, পৃথিবীর মধ্যে আপনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ-শালী সম্রাট; আপনার যশ ও গৌরব দিগন্তব্যাপী, পৃথিবীতে যত রাজগণ আছেন, সকলেই আপনার পদানত। আপনি প্রজা-গণের পিতা, আমরা আপনার সন্তানতুল্য, আমরা কোনওরূপ প্রপীড়িত হইলে, আপনাকে না জানাইয়া আর কাহাকে জানাইব?—আমাদিগের ধন, প্রাণ, মান-রক্ষার কর্ত্তাই আপনি, জগদীশ্বর আপনাকে সেই জন্যই প্রেরণ করিয়াছেন। দুর্ব্ব-

লের রক্ষা একটি রাজধর্ম্ম, আমি দুর্ব্বল প্রভো! আমাকে রক্ষা করুন, আমি অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইয়া বহু দূর হইতে আপনার দ্বারে আসিয়াছি, আমার বিপদের কথা আপনার চরণে নিবেদন করি, আপনি শুনিয়া বিচার করুন।"

সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নিবাস কোথায়,—কোথা হইতে আপনি আসিয়াছেন?"

গোরাচাঁদ উত্তর করিলেন—"প্রভো! আমি বঙ্গদেশবাসী—পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আমি আসিতেছি।"

বাদসাহ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত দূর হইতে আপনি আসিয়াছেন? আচ্ছা আপনার প্রার্থনা কি বলুন, আমি সুবিচার করিব।"

গোরাচাঁদ সেইরূপ করযোড়ে, কাতরস্বরে চন্দ্রকেতুর অত্যাচার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। যবনধ্বংস, পিতামাতার সম্মুখে বালক বালিকা বধ করিয়া গৃহে অগ্নি প্রদান, পরে সেই জ্বলন্ত অনলে হতভাগ্যদিগকে নিক্ষেপ—ইত্যাদি ঘটনা একে একে সম্রাট্কে নিবেদন করিলেন।

আগুন জ্বলিল। সমস্ত শুনিয়া সম্রাটের চক্ষে জল আসিল, ক্রোধে সেই জলন্ত নয়ন হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"আমার রাজত্বে বাস করিয়া যে নরাধম এখনও জীবিত আছে, আশ্চর্য্যের বিষয়! কাফের! তুই শৃগাল হইয়া সিংহের সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত, তোর জীবন বিনাশ করিব, তোর হিন্দুদিগকে জীবন্ত পুঁতিয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইব, তোর মহিষী আমার ভৃত্যের গোলাম হইবে, তবে এ প্রতিহিংসার পরিশোধ হইবে। প্রহরী! সেনাপতিকে ডাক?"

প্রহরী ডাকিলে, অবিলম্বে সেনাপতি আসিয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

সম্রাট সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে সেনাপতিকে কহিলেন—"তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য ও দুইটা কামান লইয়া বঙ্গদেশ যাত্রা কর। এই লোকের সঙ্গে যাও, ইনি তোমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন, সেখানে চন্দ্রকেতু নামে এক কুকুর আছে, তাহাকে সপরিবারে বাঁধিয়া লইয়া আইস। সেখানে যত হিন্দু আছে, তাহাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া, আসিবে, একটী দুগ্ধপোষ্য বালক পর্য্যন্ত যেন রাখিয়া আসিও না। যাও, অবিলম্বে প্রস্তুত হও। আবশ্যকীয় পত্রাদি যথা সময়ে পাইবে।"

সেনাপতি সম্রাট্ সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল।

সম্রাট্ গোরাচাঁদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"এখানে আপনি কোথায় অবস্থান করেন?"

গোরাচাঁদ কহিলেন—"আমি অদ্য প্রাতে এখানে আসিয়াছি, থাকিবার স্থান এখনও স্থির হয় নাই।"

সম্রাট। তবে আপনি এই স্থানেই অবস্থিতি করুন, অপর স্থানে আর যাইবার আবশ্যক নাই।

এই বলিয়া তিনি উঠিলেন, উজীরকে গোরাচাঁদের থাকিবার ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিয়া তিনি অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। সে দিনকার মত দরবার ভঙ্গ হইল।

---

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

## স্বপ্ন।

যবন বংশ ধ্বংসের পর প্রায় দুইমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। মহারাজ চন্দ্রকেতু গঙ্গাবিদায়ে হৃদয়ে যে আঘাত পাইয়াছিলেন, প্রতিহিংসায় তাহার কিয়ৎ পরিমাণে সান্ত্বনা হইয়াছে। সেই ভয়ানক দিন, সেই কাল রাত্রি অবসানের পর, চন্দ্রকেতু গোরাচাঁদকে অনেক অন্বেষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার অনুসন্ধান পান নাই। তিনি ভাবিলেন,যে,গোরাচাঁদ বোধ হয় ভয়ে কোনও দেশে পলায়ন করিয়াছে। তাহার সুখের কণ্টক দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া, তিনি মনে অনেক শান্তিলাভ করিলেন; কিন্তু গোরাচাঁদ যে তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় গিয়াছেন, এ কথা তাঁহার মনে একবারও উদয় হইল না।

কিন্তু সেই দিন,—যে দিন একের অপরাধে অন্যের জীবন নষ্ট হইয়াছিল—সেই দিন হইতেই চন্দ্রকেতু সর্ব্বদাই অমঙ্গল দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রথম অমঙ্গল সেই রাত্রেই,— যখন তিনি প্রাসাদ-শিখর হইতে অবতরণ করেন,তখন তাঁহার বামাঙ্গ স্পন্দিত হইয়াছিল, হঠাৎশিরদেশ হইতে রাজমুকুট স্খলিত হইয়া ভূমে নিপতিত হইয়াছিল, কিন্তু বীর হৃদয়ে অমঙ্গলাশঙ্কা অধিক স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু তার পর যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তিনি অধিক পরিমাণে অমঙ্গল দর্শন করিতে লাগিলেন, কত প্রকার বিভীষিকা তিনি দেখিতে পাইতেন, সামান্য শব্দে

তিনি কখনও কখনও চমকিত হইয়া উঠিতেন; ভাবিতেন যেন কোনও অরাতি তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। এইরূপ জাগরণে ও নিদ্রাবস্থায় তিনি নানাবিধ বিভীষিকা ও ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

একদিবস রাত্রে তিনি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন——

"ঘোর অন্ধকার রজনী, সেই অন্ধকার রজনীতে তিনি যেন একাকী তাঁহার দুর্গ সম্মুখস্থিত প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেছেন; এমন সময় তাঁহার সেই নিহত প্রজামণ্ডলী হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা আসিয়া যেন তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাড়াইল। হঠাৎ মৃত মনুষ্যগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে, তিনি ভীত ও বিস্মিতনয়নে তাহাদের দিকে চাহিলেন —উঃ! তাহাদের কি ভয়ানক বেশ?—তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে শোণিত মাখা, অঙ্গে বসন নাই,—উলঙ্গ!—বিকট আকার, নয়ন যেন জ্বলিতেছে, নিরন্তর দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতেছে।— ও!— একি মানুষের চেহারা!—ও আবার কি?—হস্তে, ওকি? ছুরিকা; ছুরি কেন?—চন্দ্রকেতুকে বিনাশ করিবে নাকি? আবার ঐ দেখ? এ ঘোর অন্ধকারে এত আলোক কিসের? ঐ—ঐ—সেই হতভাগাদের গৃহ ধূ ধূ জ্বলিতেছে। সেই আলোক প্রান্তর প্লাবিত করিয়াছে। সেই আলোকে সেই উলঙ্গ যবনগণের বিকটমূর্ত্তি আরও ভয়ানক দেখাইতে লাগিল। চন্দ্রকেতু ভাবিলেন,—"কতদিন আমি ঐ গৃহ দগ্ধ করাইয়াছি, এই নববর্ষার বারি নিরন্তর বরিষণ হইতেছে, তথাপিও কি উহা নির্ব্বাপিত হয় নাই? সমভাবেই জ্বলিতেছে? কি আশ্চর্য্য!"

তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় তাহারা সকলে

তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, হস্তস্থিত শাণিত ছুরিকা ঊর্দ্ধে উঠিল, এইবার বুঝি তাঁহাকে বিনাশ করিবে! চন্দ্রকেতু বীর, কিন্তু তাঁহার নিকটে অস্ত্র নাই, সঙ্গেও সৈন্য সামন্ত নাই; কি করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা হয়? এখন পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। চন্দ্রকেতু! তাই কর, পলাও পলাও আর তিলমাত্র এখানে দাড়াইও না, দেখিতেছ না, উহাদের হস্তে শাণিত ছুরিকা—তোমাকে এখনিই বিনাশ করিবে?

চন্দ্রকেতু পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চেষ্টা বৃথা। তাঁহার চতুর্দ্দিকে সেই অরাতিদল, সকলের হাতেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা, একটু মাত্র নড়িলেই সেই ছুরিকা তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে।

চন্দ্রকেতু নড়িলেন না, আর পলাইবার চেষ্টা করিলেন না, কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ সেইস্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহাদের দলের মধ্যে একজন আসিয়া তাঁহাকে যেন ধরিল, চন্দ্রকেতু সভয়ে তাহার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন—যে ধরিল, সে গ্রামের মণ্ডল ছিল। তিনি যেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমরা আমাকে ধরিতেছ কেন?"

এই কথায় সে বিকট হাসিয়া দম্ভভরে কহিল,—

"জান না কেন তোমাকে ধরিতেছি? তুমি ক্রোধে বিবেকহীন হইয়া আমাদের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ? নিরীহ প্রজাগণ তোমার কি অপরাধ করিয়াছিল? তাহাদের শিশু সন্তান গুলি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছিল? তাই তুমি তাহাদিগকে বিনাশ করিলে? তুমি রাজা, রাজধর্ম্ম কি রাখিয়াছ? যাহাদিগের ধন প্রাণ, মান রক্ষার কর্ত্তা তুমি, তাহাদিগকে অনায়াসে বিনাদোষে বিনষ্ট করিলে! যাহারা

প্রাণ দিয়া তোমার উপকার করিয়াছে, তুমি অনায়াসে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিলে! নিরুপায় দুর্ব্বল, প্রজামণ্ডলীকে নিধন করিয়া তোমার কি পৌরষ হইল, চন্দ্রকেতু? যে পাপ তুমি করিয়াছ,তাহার কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? তখন তোমার সৈন্য ছিল, রাজা তুমি যবন-বধে অনুমতি দিয়াছিলে; কিন্তু এখন তোমার সৈন্য কোথায়? কে তোমাকে এই উন্মত্ত যবন-হস্ত হইতে রক্ষা করিবে? অপঘাত-মৃত্যুতে আত্মার গতি হয় না, তাই নিহত প্রজামণ্ডলী তাহাদিগের অন্যায় মরণের প্রতিশোধ দিতে আসিয়াছে। আজ আর তোমার নিস্তার নাই, ঐ যে আগুণ জলিতেছে—ঐ জলন্ত অনলে তোমাকে জীবন্ত দগ্ধ করিব;—তোমার মৃত্যু নিশ্চয়, মরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হও।”

চন্দ্রকেতু নীরব,—নিস্পন্দ, কথা কহিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, তাঁহার জিহ্বার জড়তা হইয়াছে, শক্তি লোপ পাইয়াছে। নিকটেই তাঁহার দুর্গ; দুর্গে শতশত সজ্জিত প্রহরি প্রহরা দিতেছে, একবার মাত্র উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলে এখনি ছুটিয়া আসিবে, আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে; কিন্তু সে শক্তি তাঁহার নাই, তিনি জীবিত কি মৃত তাহার নিশ্চয় নাই, সেইরূপ কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রেত-দলের বিকট মূর্ত্তি দেখিতেছেন।

আবার কি সর্ব্বনাশ? যে প্রেত তাঁহার সহিত কথা কহিতেছিল, সে তাঁহাকে দৃঢ়রূপে ধরিল, তাঁহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল, তাঁহার বক্ষঃস্থলে চাপিয়া বসিল। চন্দ্রকেতুর নিরোধ হইবার উপক্রম হইল, তাঁহার বক্ষঃস্থলে বসিয়া তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা উঠাইল, জলিত

গৃহালোকে শাণিত ছুরি চক্‌মক্ করিয়া উঠিল,—আর এক মুহূর্ত্ত!—এক মুহূর্ত্ত পরে চন্দ্রকেতুর জীবনলীলা শেষ হইবে। চন্দ্রকেতু ভয়ে মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন। এমন সময় আবার একজন কে আসিল, আসিয়া যে বক্ষে বসিয়াছিল, তাহাকে কি বলিল, সে বক্ষঃস্থল ছাড়িয়া উঠিল, চন্দ্রকেতু ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, আগন্তুক—গোরাচাঁদ! গোরাচাঁদের এখন আর সে শান্তমূর্ত্তি নাই, এখন ভীষণবেশে প্রতিহিংসার পরিশোধ দিবার নিমিত্ত, উন্মত্ত ভাবে গোরাচাঁদ উপস্থিত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার নয়ন জ্বলিতেছে, দক্ষিণ হস্তে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ শাণিত ছুরিকা! গোরাচাঁদ চন্দ্রকেতুকে উঠিতে বলিলেন, চন্দ্রকেতু ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গোরাচাঁদ কটিবন্ধ হইতে একগাছি রজ্জু বাহির করিলেন এবং তদ্দ্বারা দৃঢ়রূপে চন্দ্রকেতুকে বাঁধিতে লাগিলেন। চন্দ্রকেতু সেইরূপ নীরব, নিস্পন্দ—যেন জড় পদার্থের ন্যায় হইয়া রহিলেন, ভয়ে তাঁহার কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে; তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া পার্শ্বস্থিত পিশাচগণ খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এইবার গোরাচাঁদের হস্তস্থিত ছুরিকা ঊর্দ্ধে উঠিল; চন্দ্রকেতুর মোহ ভাঙ্গিল—তাঁহার কথা ফুটিল, তিনি কাতরবচনে গোরাচাঁদের নিকট জীবন ভিক্ষা চাহিলেন।

গোরাচাঁদ জ্বলিয়া উঠিলেন, তিনি কর্কশস্বরে কহিলেন, "ক্ষমা নাই! তুই যে কায করিয়াছিস্, তাহার ফলভোগ কর।"

ছুরিকা আবার ঊর্দ্ধে উঠিল, এইবার বুঝি তাহার জীবন শেষ হইবে। অকস্মাৎ বজ্রশব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

## রণসজ্জা।

চন্দ্রকেতুর নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি উঠিয়া শয্যাপরি বসিলেন। তখন সূর্য্য উঠিয়াছে, বাল সূর্য্যের তরুণ কিরণ, উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া তাঁহার শয্যায় আসিয়া পড়িয়াছে। সেই আলোকে তিনি দেখিলেন, ঘর্ম্মে শয্যা ভিজিয়া গিয়াছে। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার দেহ দুর্ব্বল, পদদ্বয় যেন দেহভার বহনে অশক্ত, যেন বহুকাল রোগভোগের পর তাঁহার অদ্য উত্থান-শক্তি হইল। তিনি ধীরে ধীরে দাঁড়াইলেন। আবার আকাশ পাতাল কম্পিত করিয়া বজ্রনাদের ন্যায় কি শব্দ হইল। একি!—এ ত বজ্রধ্বনি নয়?—তিনি ত্বরিৎ পদে বাতায়নে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন তাঁহার দুর্গ সম্মুখস্থিত প্রান্তরে, সারি সারি তাঁবু পড়িয়াছে, তাহার উপর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পতাকা সকল প্রভাত-হিল্লোলে খেলা করিতেছে। তখন তিনি অনুমান করিলেন যে, যে বজ্রধ্বনি তিনি শুনিয়াছিলেন, তাহা মোগলের কামান-শব্দ!

চন্দ্রকেতু বাতায়নে দাঁড়াইয়া যবনসৈন্য দেখিতে লাগিলেন। আবার মোগলের কামান ডাকিল; বজ্রধ্বনি তুচ্ছ করিয়া সে ধ্ব[illegible] ব্যোমপথে ছুটিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ধ্বনি থামিতে না থা[illegible] চন্দ্রকেতুর দুর্গ-প্রাকার হইতে কামান শব্দ হইল, মুসলমানের কামানের প্রত্যুত্তর দিল।

এইবার চন্দ্রকেতুর বদন প্রফুল্ল হইল, বীরের উষ্ণ শোণিত শিরায় শিরায় ছুটিল, জ্যোতিহীন নয়ন আবার জ্বলিয়া উঠিল, তিনি দ্রুতপদে কক্ষত্যাগ করিলেন।

প্রভাতে যখন প্রথম কামান-ধ্বনি হয়, সেই শব্দে দুর্গবাসী সকলে চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠে। যে সমস্ত প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা দুর্গ-প্রকারে উঠিয়া বাহিরে দেখিল—অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্যে প্রান্তর পরিপূর্ণ হইয়াছে; অনুমানে বোধ হইল, তখনি তাহারা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহাদিগের পরিচ্ছদ ও পতাকা দেখিয়া তাহাদিগকে যবন বলিয়া চিনিতে পারিল। অকস্মাৎ অসংখ্য যবন সৈন্য দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল, ত্বরায় সেনাপতির নিকট সংবাদ দিল। সেনাপতিও নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনিও শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন, এমন সময় প্রহরী গিয়া অভিবাদন করিয়া সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

সেনাপতির নাম—বিজয়লাল। তিনি বীর এবং অতিশয় বুদ্ধিমান। যে দিবস চন্দ্রকেতু প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া নৃশংস-ভাবে যবনহত্যা করিয়াছিলেন, সেই দিন তিনি তাহার ভাবিফল অনুমান করিয়াছিলেন এবং তাহার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া-ছিলেন। দুর্গের ভগ্ন ও জীর্ণ স্থান সকল সংস্কার ও যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করাইতে তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। এই ... য করাতে চন্দ্রকেতু তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ... অপর একটী কথা বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ...কেতুর পাঁচসহস্র সৈন্য ছিল এই পাঁচ সহস্র সকলেই সুশিক্ষিত, রণনিপুণ এবং কার্য্যদক্ষ ছিল।

প্রহরী মুখে তিনি যবনদিগের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন, অনুমান করিলেন গোরাচাঁদ মোগলসৈন্য আনিয়া তাঁহার যবনকুল বিনাশের প্রতিশোধ দিতে আসিয়াছে। তিনি মনে মনে একটু হাসিয়া, আপনাআপনি কহিলেন,—

"গোরাচাঁদ, তুমি কি ভাবিয়াছ, দুইমাসের পথ হইতে সৈন্য আনিয়া চন্দ্রকেতুকে পরাজিত করিবে?—তা' যদি ভাবিয়া থাক, তবে তোমার ভুল হইয়াছে, সিংহকে গহ্বর হইতে বাহির করিয়া ধৃত করিব, এ আশা বাতুলে করিয়া থাকে? বিজয়লাল জীবিত থাকিতে চন্দ্রকেতুর একগাছি কেশস্পর্শ করে, এমন বীর মোগল সৈন্যে আমি দেখিতে পাই না। তিন সহস্র সৈন্য! আমি ত উহা মুষ্টিমেয় তৃণদল মনে করি, যদি বিংশতি সহস্র হয়, তথাপিও বিজয়লাল ভীত নহেন। আমার এই পাঁচ সহস্র সৈন্য বাহুবলে আমি উহাদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিয়া আসিতে পারি।"

বিজয়লাল নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, রাত্রবাস পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইলেন। প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ভীমরবে রণভেরি বাজাইলেন। সে ভেরীশব্দ মোগল শিবিরে পৌঁছিল মোগল সেনাপতি পুনরায় কামান দাগিতে হুকুম দিলেন। দ্বিতীয় বার শত্রুশিবিরে কামান শব্দ শুনিয়া বিজয়লাল নিজ কামানে আগুণ দিতে আজ্ঞা দিলেন। মোগলের কামান শব্দ থামিতে না থামিতে বিজয়লালের কামান প্রত্যুত্তর সেই শব্দে চন্দ্রকেতুর মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, দুর্ব্বল দেহে বল সঞ্চার হইয়াছিল, উষ্ণ শোণিত শিরায় শিরায় ছুটিয়াছিল।

চন্দ্রকেতু দ্রুত পদে কক্ষত্যাগ করিয়া প্রাঙ্গণে আসিলেন; দেখিলেন যে, বিজয়লাল সৈন্য সজ্জিত করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। তিনি আসিয়া আহ্লাদে সেনাপতিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। হর্ষে সেনাপতির বদন আরক্তিম হইল, উৎসাহে নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, তিনি উচ্চৈঃস্বরে সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"অনেক দিন আমরা আমাদের ভুজবল পরীক্ষা করি নাই, অনেকদিন আমাদের শাণিত কৃপাণ শত্রু-শোণিত পান করে নাই। আজ আমাদের বাহুবল পরীক্ষার দিন—কৃপাণের শোণিত-পিপাসা মিটাইবার সময় উপস্থিত; অতএব, ভ্রাতৃগণ! বন্ধুগণ! চল আমরা বাহুবলে শত্রু নিধন করিয়া আমাদিগের মনঃ বাসনা পূর্ণ করি। মোগল সৈন্য আমাদিগকে সমূলে বিনাশ করিতে আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে তা' বোধ হয় সকলের স্মরণ নাই। যদি না থাকে, তবে শুন, গঙ্গা-বিদায় উপলক্ষ করিয়া যে অনল জ্বলিয়া ছিল,—যে অনলে যবন-শোণিতে আহুতি পড়িয়াছে,—সেই প্রতিহিংসার পরিশোধ লইবার জন্য গোরাচাঁদ দিল্লী হইতে মোগল সৈন্য আনিয়াছে; আসুক, আমরা কি তাহাতে ভীত হইব? ভাই মোগলসৈন্য দুইমাসের পথ অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে নিধন করিতে বঙ্গদেশে আসিয়াছে; তাহারা বীর; কিন্তু আমরা কি দুর্বল হস্তে অসি ধারণ করি? আমরা কি এই মুষ্টিমেয় যবন সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া স্বদেশ উদ্ধার করিতে পারিব না? অবশ্য পারিব। যদি না পারি, যদি নিজের ধন, প্রাণ, মান রাখিতে না পারি, এত দিবস যার নিমক খাইয়াছি, যিনি আমাদিগকে

এত দিন পুত্রের ন্যায় সযত্নে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারি, তবে ধিক্ আমাদের বাহুবলে! ধিক্ আমাদের এই অসার জীবনে আর শত ধিক্ যুদ্ধশিক্ষায়! যবন শিক্ষিত, আমরাও অশিক্ষিত নহি; তবে কেন পারিব না? অবশ্য পারিব; পারি কি না— আমাদের বাহুতে বল আছে কি না, আজ তাহার পরীক্ষা করিব। যদি না পারি, তাহা হইলে আমরা একে একে প্রভুর রক্ষার নিমিত্ত রণস্থলে শয়ন করিব সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জনের ফল—অক্ষয় স্বর্গ! লোকে বলিবে যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছে, কাপুরুষ কেহ বলিবে না। বীরের সেই গৌরব— মরিয়াও বীরগণ তাহাতেই অমর হইয়া থাকে। যবনের বাহুবল আছে, আমাদের ও আছে; তবে আমরা ভয় করিব কেন? আজ আমরা বাহুবলে আমাদের দেশের শত্রু— আমাদের জাতির শত্রু—ধর্ম্মের শত্রু—নিধন করিয়া হিন্দুর মুখোজ্জ্বল করিব, জন্মভূমিকে শত্রু-হস্ত হইতে উদ্ধার করিব। সকলে একত্রে কালী কালী বল।”

বিজয়লাল নীরব হইলেন। তাঁহার জলন্ত উৎসাহিত বাক্যে উৎসাহিত সৈন্যগণ, সমস্বরে ‘কালী কালী’ বলিয়া উঠিল।

# নবম পরিচ্ছেদ।

## প্রথম দিনের যুদ্ধ।

যবন-শিবিরে ভেরি বাজিল। শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যগণ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইল।

প্রথমে একদল সৈন্য, তার পশ্চাতে একটা কামান, তৎপরে একদল সৈন্য, তার পশ্চাতে আর একটা কামান। পরে আর একদল সৈন্য, সর্ব্বপশ্চাতে সেনাপতি। এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মোগল সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

শত্রু সৈন্য নিকটস্থ হইতেছে দেখিয়া, বিজয়লাল চন্দ্রকেতুর নিকট বাহির হইয়া শত্রুকে বাধা দিবার অনুমতি চাহিলেন। চন্দ্রকেতু অনুমতি দিলেন। বিজয়লাল তিন সহস্র সৈন্য লইয়া শত্রুকে বাধা দিবার নিমিত্ত দুর্গের বাহির হইলেন।

অবরুদ্ধ বারি-রাশি মুক্তপথ পাইলে যেরূপ প্রবল বেগে বহমান হয়, সেইরূপ হিন্দুসৈন্য যবনসৈন্যের উপর পড়িল।

যবনসৈন্যও অপ্রস্তুত ছিল না, তাহারাও বাধা দিল। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। একপক্ষে মোগলের ভুবনবিজয়ী সৈন্য প্রতিহিংসায় উত্তেজিত; অপরপক্ষে মহাবলশালী হিন্দুগণ তাঁহাদের ধন, প্রাণ, মান রক্ষার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উভয়দলে ভীষণ চলিতে লাগিল।

দুইপক্ষে ঘোরতর সমর চলিতেছে, কিন্তু উভয় পক্ষেরই একটা অসুবিধা হইল। মোগলগণের অসুবিধা তাহারা সকলেই

অশ্বারোহী হিন্দুসৈন্য পদাতিক। পদাতিকে ও অশ্বারোহীতে যুদ্ধ করা বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল এবং মোগলপক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল। অশ্ব নিধনের সঙ্গে সঙ্গে বহুতর সেনা নিহত হইতে লাগিল। হিন্দুপক্ষের অসুবিধা,—মোগলের কামান আছে, তাহাদের নাই। হিন্দুদিগের দুইটী বই কামান নাই, সে দুইটিও দুর্গ রক্ষার্থে রাখিয়া আসিয়াছে। বিশেষ আগ্নেয় অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত পরিমাণ গোলা বারুদ তাহাদের ছিল না। মোগলের কামান এক একবার অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে হিন্দুর পক্ষে অল্প বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু অধিক ক্ষতি করিতে পারিতেছে না।

মোগলের যে ক্ষতি হইতেছিল, তাহাতে তাহাদের অশ্বত্যাগ করিয়া পদে যুদ্ধ করা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। মোগল সেনাপতি বুঝিলেন যে অশ্বত্যাগ না করিলে, অতি অল্পক্ষণের মধ্যে পরাজিত হইতে হইবে; আর যেরূপ বিক্রমের সহিত হিন্দুগণ যুদ্ধ করিতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার অন্তরে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চারও হইল। তিনি সৈন্যগণকে পশ্চাতে গমনের সঙ্কেত করিলেন। ধীরে ধীরে মোগলসৈন্য পিছু হটিতে লাগিল; যবনদিগকে পিছু হটিতে দেখিয়া হিন্দুগণের হৃদয়ে উৎসাহ হইল, তাহারা দ্বিগুণ বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে মোগলসৈন্য অনেক দূর পিছাইয়া আসিল। তখন সেনাপতি উচ্চৈঃস্বরে অশ্বত্যাগ করিয়া ভূমিতে নামিয়া যুদ্ধ করিবার অনুমতি দিলেন। নিমেষমধ্যে সমস্ত সৈন্য অশ্ব ত্যাগ করিল। অশ্বগণ স্বেচ্ছা বিচরণ করিতে লাগিল। আবার ঘোরতর সমর বাধিল।

বিজয়লাল সমরে উন্মত্ত, তাঁহার দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই, হস্তের বিরাম নাই, অব্যর্থ আঘাতে অগণিত শত্রুসৈন্য নিহত হইতেছে। হিন্দুর বীরত্বে যবন টলিতে লাগিল, মোগল সেনাপতি মনে মনে প্রমাদ গণিল, দূর হইতে হিন্দুর অতুল বিক্রম, অপার রণকৌশল দেখিতে লাগিল। যবন বাহিনী চঞ্চল, সর্ব্বদাই ইতঃস্তত দৃষ্টি করিতেছে, রণস্থলে অবস্থিতি করা তাহাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। মোগল সেনাপতি আপনার অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন; বিজয়লালের বিক্রমে বাধা দিতে না পারিলে যবনের সর্ব্বনাশ হইবে, এ কথা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন; অতএব দ্বিগুণ উৎসাহে রণভেরি বাজাইয়া, বিজয়লালের গতি রোধ করিতে অশ্ব ছুটাইলেন।

ভেরি-শব্দে যবনসৈন্য একটু স্থির হইল, তাহাদের হতাশ অন্তরে যেন একটু আশার সঞ্চার হইল, তাহারা আবার যুদ্ধে মনোযোগী হইল।

যেখানে বিজয়লাল যুদ্ধ করিতেছিলেন, যবন সেনাপতি তথায় আসিলেন, বিজয়লালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—

"হিন্দু বীর, আজ তুমি বড়ই বিক্রম দেখাইয়াছ, তোমার বিক্রমে আমার বাহিনী চঞ্চল হইয়াছে, তোমার মত সেনাপতি চন্দ্রকেতুর আর কয় জন আছে?"

বিজয়লাল বিস্ফারিত নয়নে মোগল সেনাপতির প্রতি চাহিয়া, কহিলেন,—

"যবন!—বীরত্বের কথা কহিতেছ, আমি অতি হীনবল, আমার যিনি প্রভু,—সেই মহারাজ চন্দ্রকেতু, তাঁহার বিক্রম

অতুল, তাঁহার বাহুবল অসীম। আমি তাঁহার ক্ষুদ্র সেনাপতি, তাঁহার আর সেনাপতি নাই।"

মোগল সেনাপতি কহিলেন,—"শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু তোমার প্রভু কি ভাবিয়াছেন যে, এই অসংখ্য মোগল সেনা পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য নিষ্কণ্টক করিতে পারিবেন?—যদি আমিও পরাজিত হই, কিন্তু দিল্লীশ্বরের আর শত শত সেনাপতি আছে, এই ক্ষুদ্র রাজ্য শ্মশানে পরিণত করিবে। তোমার প্রভুকে গিয়া বল, যদি তিনি নিজের মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তবে দিল্লীশ্বরের চরণে শরণ লউন, নতুবা তাঁহার নিস্তার নাই।"

বিজয়লাল হাসিয়া কহিলেন,—"সিংহ কি আপন ইচ্ছায় পিঞ্জরাবদ্ধ হয়?"

যবন সেনাপতি। দিল্লীশ্বরের কি আজ্ঞা তাহা শুনিয়াছ?

বিজয়লাল। 'না'।

সেনাপতি। তিনি অনুমতি করিয়াছেন যে, যদি চন্দ্রকেতু সহজে আত্মসমর্পণ না করে, তবে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে জীবন্ত হউক অথবা মৃত হউক দিল্লীতে আনিবে। সেখানে যত হিন্দু আছে, সকলকে ধৃত করিবে;—পুরুষ, রমণী, বালক বালিকা কাহাকেও বাদ দিবে না। চন্দ্রকেতুর মহিষীকে আনিবে—সে আমার ক্রীতদাসের গোলী হইবে। প্রভুর কয়টি মহিষি?

বিজয়লালের ক্রোধে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সগর্ব্বে কহিলেন—তুমি যুদ্ধ ক'রিতে আসিয়াছ যুদ্ধ কর, শক্তি থাকে বাহুবলে চন্দ্রকেতুকে পরাজিত করিয়া ধৃত কর;—এখন ওসব বৃথা আস্ফালনে আবশ্যক কি?—হিন্দুললনা বিধর্ম্মীকে কুক্কুরের ন্যায় বাম পদাঘাতে দূর করে!"

যবন সেনাপতি হাসিয়া কহিল—

"শুনিয়াছি, রাজরাণী ভুবনেশ্বরী খুব খোপ সুরত, যদি তাহাকে জীবন্ত ধরিতে পারি, তবে—

বিজয়। "তবে কি ?"

সেনা। "তবে তাহাকে ইশ্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আমি তাহাকে নেকা করি।"

বিজয়লালের চক্ষু হইতে অগ্নিফ্লিঙ্গ নির্গত হইল, হস্তস্থিত শাণিত কৃপাণ সূর্য্যালোকে চক্‌মক্ করিয়া উঠিল, ভীষণ বেগে যবনের উপর পতিত হইয়া তাহার উদ্ধত বাক্যের প্রত্যুত্তর দিল। আবার উভয় পক্ষে ভয়ানক সমর বাধিল।

যে সময়ে যবনগণ প্রায় পরাজিত হইয়াছে, বিজয়লালের সহিত সংগ্রামে যবন সেনাপতির বলের হ্রাস হইতেছে, তাহার চতুর্দ্দিকে হিন্দুসৈন্য বেষ্টন করিয়াছে, তাঁহার জীবন শঙ্কটাপন্ন; বিজয়লাল সমরে উন্মত্ত। অকস্মাৎ কোথা হইতে একটি তীক্ষ্ণ শর আসিয়া বিজয়লালের বাহুতে বদ্ধ হইল, বিজয়লাল তাহাতে ভ্রূপেক্ষও করিলেন না, সবলে তাহা উন্মোচন করিয়া পুনরায় রণরঙ্গে মত্ত হইলেন; আবার একটি তীর আসিয়া গ্রীবা বিদ্ধ করিল, তাহা খুলিতে না খুলিতে উপর্য্যুপরি তিন চারিটি শর আসিয়া তাঁহার দেহে বিদ্ধ হইল। এইবার বিজয়লাল ভীত হইলেন, অনবরত রক্ত মোক্ষণে তাহার বলের হ্রাস হইতে লাগিল। এ দিকে ক্রমাগত তীক্ষ্ণ শর আসিয়া তাঁহার দেহে বিদ্ধ হইতেছে। তিনি এই বিপদের সময় একবার প্রশান্ত নয়নে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, যে সমস্ত হিন্দুসৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইতেছিল, তাহারা সকলেই নিধন

হইয়াছে। তদুপরি দাঁড়াইয়া যবনগণ সমর করিতেছে, তিনি যবন বেষ্টিত। দূরে তাহার সৈন্যগণ ঘোরতর সমরে যবন নিধন করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা।

তিনি দেখিলেন আর নিস্তার নাই; নিজ বাহুবলে, যবন-ব্যূহভেদ করিবার শক্তি তাঁহার নাই;—তখন আর জীবনের আশাও নাই। "তবে আর কেন, এখন যত পারি শত্রু বিনাশ করিয়া জীবন ত্যাগ করি।"—এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে দুই হস্তে অসি ধারণ করিলেন। এই আহত অবস্থাতেই তিনি ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সে কতক্ষণ? অস্ত্রাঘাতে দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে; তাহা হইতে প্রবল বেগে শোণিতস্রাব হইতেছে। ক্রমে বাহু বলহীন হইল, অঙ্গ অবশ হইল, নয়ন জ্যোতিহীন হইল, তিনি চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। মস্তক ঘুরিতে লাগিল, লক্ষের স্থিরতা নাই, শত্রুর আঘাতের প্রতিঘাত করিবার ক্ষমতা নাই, তথাপি তিনি অসিচালনা করিতেছেন।

অকস্মাৎ শত্রুর অসি তাহার কণ্ঠচ্ছেদ করিল, তিনি ছিন্ন কদলি বৃক্ষের ন্যায় অশ্ব হইতে নিপতিত হইলেন। তাঁহার জীবন-বায়ু বহির্গত হইল।

যবনগণ জয়ধ্বনি করিল। হিন্দুগণ তাহাদের সেনাপতির অন্যায়রূপে নিধন দেখিল, তাহারা ভীত হইল না, টলিল না; কেবল জ্বলন্ত নয়ন ও নীরব অসিচালনা তাহাদিগের অন্তরে বেদনার পরিচয় দিল।

এইরূপ সমস্ত দিবস যুদ্ধের পর, সন্ধ্যার সময় পাঁচ শত মাত্র হিন্দুসৈন্য রণস্থল ত্যাগ করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিল।

# দশম পরিচ্ছেদ।

## বিদায়।

রাজভবনে একটি প্রকোষ্ঠে রাজরাণী ভুবনেশ্বরী বসিয়া আছেন। তাঁহার এলাইত কেশপাশ ইতস্ততঃ বিন্যস্ত, অযত্ন রক্ষিত, পৃষ্ঠে অংশে ও গণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পদ্মপলাশের ন্যায় লোচন-যুগল জলভারাক্রান্ত,—বিম্বাধর শুষ্ক ও মলিন; ক্রোড়ে তাঁহার জীবনধন—সংসারের অমূল্যরত্ন পুত্রটী শুইয়া খেলা করিতেছে।

ভুবনেশ্বরী গভীর চিন্তায় নিমগ্না। পতির উপস্থিত বিপদে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত।—'রণে কি হয়'—এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল। আর চিন্তা—সেই জ্ঞানহীন শিশুর জন্য। যদি একান্তই রণে পরাজয় হয়, যদি একান্তই বিধাতা বিমুখ হয়েন, তাহা হইলে সেই পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের উপায় কি হইবে?—এই ভাবনাই তিনি ভাবিতেছিলেন। ভাবিয়া সেই অপার বিপদ্ সাগরের কূল কিনারা দেখিতে পাইতেছেন না।

ধাত্রী ধীরে ধীরে সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং রাণীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু চিন্তামগ্না ভুবনেশ্বরী তাহা দেখিতে পাইলেন না। ধাত্রী অনেকক্ষণ পরে রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল—

"মা, অত ভাবিয়া কি করিবেন? ভগবানকে ডাকুন, তিনিই রক্ষাকর্ত্তা, এ বিপদে তিনিই উদ্ধার করিবেন।"

রাণীর চিন্তাস্রোত থামিল, তিনি বদন তুলিলেন, দুই হস্তে নয়নাশ্রু মুছিয়া ধাত্রীকে কহিলেন—

"না ধাত্রি! আমার ভাবনা আমি করি না কিম্বা স্বামীর ভাবনাও ভাবি না। পতি আমার বীর পুরুষ; বীরের ব্যবসা—যুদ্ধ, বীরের ধর্ম্ম—সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন!—কাপুরুষের ন্যায় রমণী-অঞ্চল ধরিয়া গৃহে বসিয়া থাকা বীরের ধর্ম্ম নহে। তা আমি জানি, সে জন্য আমি চিন্তিত নই; যদি সেই সর্ব্বনাশ হয়, যদি অদৃষ্টে আমার তাই থাকে, তবে আমি দাসী—প্রভু আমার যে পথে যাইবেন, আমিও সেই পথে যাইব। বীরের স্বগায় অস্ত্র, রমণীর স্বগায় অনল; জল ও অনলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া পতির অনুগামিনী হইব। তাই বলিতেছিলাম,—আমার সে ভাবনা নাই, আর সে বিষয় ভাবিয়া আমিই বা কি করিব? ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে। আমার ভাবনা এই বালকের জন্য—রাজার একমাত্র বংশধরের জন্য। ইহাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইব, কে ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে? এই ভাবনায় আমি আকুল হইয়াছি।"

ধাত্রী কহিল,—"মা! মানুষের সহায় ঈশ্বর, তিনি ভিন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার কাহারও শক্তি নাই। এক মনে তাঁহাকেই ডাকুন, তিনি অবশ্যই আপনাকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন।"

এমন সময় চন্দ্রকেতু রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গ বর্ম্মে আচ্ছাদিত, তদুপরি বহুমূল্য মণি-মুক্তা-খচিত পরিচ্ছদ, কটিদেশে হীরকমণ্ডিত পিধানে খরশাণ অসি বিলম্বিত, পৃষ্ঠে ধনুঃশর,—মস্তকে উষ্ণীষ। তিনি উপস্থিত

হইয়া রাণীকে কহিলেন,—"প্রিয়ে! আমি সমরে গমন করিব, তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি, আমাকে বিদায় দাও; যে বন্ধনে এত দিবস অবিচ্ছিন্ন ছিলাম, আজ সেই প্রেম-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি চলিলাম। বোধ হয়, আর দেখা হইবে না, আর তোমার ঐ প্রফুল্ল বদন-কমল দেখিতে পাইব না, বোধ হয় জন্মের মত তাহা ফুরাইল। আমার হৃদয়রত্ন, বংশের দুলাল—প্রিয় কুমারকে আর দেখিতে পাইব না, তাহার অমিয়মিশ্রিত আধ-আধ ভাষ শুনিয়া আর এ হৃদয় উল্লাসিত হইবে না, শ্রবণ জুড়াইবে না; তাহাও বুঝি জন্মের মত ফুরাইল! আমি চলিলাম, যাইবার সময় তোমাকে একটা কথা বলিয়া যাই, যদি আমি রণে নিহত হই, তাহা হইলে, তুমি কুমারকে লইয়া এখান হইতে পলায়ন করিও। যে ধন রত্ন আমার রহিল, তাহাতে অনায়াসে তোমার ও কুমারের ব্যয় ভার চলিবে,—এ স্থান ত্যাগ করিয়া অনেক দূরে যাইও, অতি গোপনে, যেন যবনে জানিতে না পারে। আমি দুইটি পারা-বত সঙ্গে লইয়া চলিলাম, যদি আমি জয়লাভ করিতে পারি, তবে আমি স্বয়ং আসিব, আর যদি আমার পরাজয় হয়, শত্রু-হস্তে যদি আমার জীবন নিধন হয়, তাহা হইলে, এই পারাবত আমি ছাড়িয়া দিব। যে সময় ইহা উড়িয়া আসিয়া প্রাসাদে বসিবে, তখন জানিবে আমি আর ইহ জগতে নাই, আমার জীবন শেষ হইয়াছে। সেই সময় তুমি কুমারকে লইয়া এই ধাত্রীকে সঙ্গে করিয়া এ স্থান ত্যাগ করিও, কাল বিলম্ব করিও না, অতি গোপনে যাইবে, যেন শত্রুতে জানিতে না পারে; শত্রুর নয়ন পড়িলে আর রক্ষা করিতে পারিবে না। এখন দাও রাণী—

একবার কুমারকে আমার কোলে দাও, আমি জন্মের মত একবার কোলে করি, জন্মের মত নয়ন ভরিয়া বাছাকে দেখিয়া লই।”

চন্দ্রকেতু বাহু প্রসারণ করিলেন, ভুবনেশ্বরী কুমারকে তাঁহার কোলে দিয়া নিজ নয়নজল মুছিয়া কহিলেন,—

“প্রাণেশ্বর! আপনি কি ভাবিয়াছেন যে, আপনার অদর্শনে আমি জীবিত থাকিব? যদি তাহা ভাবিয়া থাকেন, তবে আপনার ভুল হইয়াছে; জীবন অভাবে কি দেহ থাকে? আপনি আমার জীবন, আমি দেহ মাত্র, আপনার বিহনে আমার দেহ থাকিবে না। আপনি কায়া—আমি ছায়া, কায়া যে পথে যায়, ছায়াও সেই পথে যাইবে। আপনি প্রভু, আমি দাসী, প্রভু যেখানে যাইবেন, দাসীও সেইখানে যাইবে। আপনি বীর, আপনি সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গে যাইবেন, আমি দুর্ব্বল রমণী, অনলে ঝাঁপ দিয়া আপনার সহগামনী হইব। রমণীর পতিই দেবতা, পতি ভিন্ন অন্য গতি নাই, পতিবিরহে রমণী বাঁচিতে পারে না। আপনি সমরে যাইতেছেন, আমি নিবারণ করিব না কিম্বা নয়ন জল ফেলিব না। সে সকল অমঙ্গলে চিহ্ন; কিন্তু নাথ! এ কথা নিশ্চয় জানিবেন যে, আপনার বিরহে দাসীর জীবন এক দিনও থাকিবে না।”

চন্দ্রকেতু ভুবনেশ্বরীর এইরূপ বীরোক্তিতে, অতিশয় বিস্মিত হইলেন; তিনি তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন;—

“প্রিয়ে! তোমার উত্তর বীরাঙ্গনার ন্যায়ই হইয়াছে, কিন্তু প্রিয়ে তুমি যা' ভাবিয়াছ, তাহা হইবে না, যে রত্ন তোমার রহিল, তাহা অমূল্য, তাহাকে রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে থাকিতে

হইবে। তুমি না থাকিলে, তোমার সুশীলের উপায় কি হইবে?"

রাণী কহিলেন, "কি হইবে, সে ভাবনা আমার কেন নাথ! যিনি ভাবিবেন, তিনি ত চলিলেন, আমি অবলা, আমি ভাবিয়া কি করিব? যিনি উহাকে জীবন দিয়াছেন, সেই জগৎপিতা উহাকে দেখিবেন, উহার ভাবনা তিনিই ভাবিবেন, আমি ভাবিব না। আমি জীবনে মরণে যাঁহার সঙ্গিনী, যিনি আমার আরাধ্য দেবতা, শয়নে, স্বপনে, নিশি দিনে যে মূর্ত্তি আমি ধ্যান করি, যে বিনে এ সংসার আমার অন্ধকার, সেই তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেইখানে যাইব। কোনও মায়া মোহ আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না।"

চন্দ্রকেতু কহিলেন,—"আমি চলিলাম. আর আমি বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করিও।"

এই বলিয়া তিনি পুত্রের মুখ চুম্বন করিলেন, তাহাকে আবার বক্ষে ধরিয়া কহিলেন,—"বাপ আমার, আমার জীবন ধন! আজ আমি তোমায় জন্মের মত কোলে করিলাম! তুমি এখন অজ্ঞান, যখন তোমার জ্ঞান হইবে, তখন তোমার এই হতভাগ্য পিতাকে আর দেখিতে পাইবে না! থাক বৎস! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করুন, তোমাকে সুখী করুন।"

তিনি তাঁহাকে আবার বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন, তাহার গণ্ডে শত শত চুম্বন করিয়া তাহাকে রাণীর কোলে দিয়া কহিলেন,—

"ধর প্রিয়ে,—এই অমূল্য রত্ন! রহিল, তুমি দেখিও,—আমি এই জন্মের মত দেখিলাম!"

তিনি নিস্তব্ধ হইলেন, অশ্রু তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল। ভুবনেশ্বরী আর কথার উত্তর দিতে পারিলেন না, তাঁহার বক্ষঃ ফাটিয়া যাইতেছিল, চন্দ্রকেতুর প্রত্যেক কথা তাঁহার হৃদয়ে শেল বিঁধিতে ছিল, তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন।

রাজা ধীরে ধীরে পুত্রকে রাণীর কোলে দিয়া কহিলেন,—"তোমাকে ছাড়িতে আজ আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু কি করিব, দেশের মান রাখিতে, জন্মভূমির উদ্ধার করিতে আজ আমি অগ্রসর, মহাব্রত আজ আমি পালন করিব; জানি না, জগদীশ্বর আমার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন। অদৃষ্টে যাহাই থাক, আজ তাহার পরীক্ষার দিন। হয় বঙ্গদেশ ম্লেচ্ছ পদাঘাত হইতে ত্রাণ পাইবে, নহে চিরকালের মত দাসত্বশৃঙ্খল চরণে পরিবে। আজ আমার অসির উপর বঙ্গের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে।"

একজন প্রহরী প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল,—"শত্রুসৈন্য ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, তাই হাবিলদার আপনার নিকট সংবাদ দিল।"

চন্দ্রকেতু কহিলেন,—"আচ্ছা তুমি যাও, আমি যাইতেছি।" প্রহরী অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

চন্দ্রকেতু ভুবনেশ্বরীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"প্রিয়ে, তবে চলিলাম, আর বিলম্ব করিতে পারি না, ঐ শুন শত্রুর কামানের শব্দ শোনা যাইতেছে। এ সময়ে আমি অন্তঃপুরে থাকিলে, আমার সৈন্যগণ আমাকে কাপুরুষ মনে করিবে।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে আবার গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আবার পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া জন্মের মত বিদায় হইলেন। রাণী অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে জন্মের মত পতিকে দেখিলেন, যখন নয়-নের অন্তরাল হইল, তখন তিনি তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—

"যাও প্রাণেশ্বর! যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া হিন্দুর মুখোজ্জল কর। তুমি সৎকর্ম্মে যাইতেছ, আমি তাহাতে বাধা দিব কেন? মা মঙ্গলচণ্ডী তোমার মঙ্গল করুন, তাঁহার শ্রীচরণে দাসীর এই ভিক্ষা। কিন্তু নাথ! আমি অবলা, আমার হৃদয় নিতান্ত দুর্ব্বল; এ বিদায়ে তাহা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, নয়নের জল নিবারণ হইতেছে না; আমার জীবনসর্ব্বস্ব তুমি, তোমা বিহনে দাসী থাকিবে না, তুমি যেখানে যাইবে দাসীও সেইখানে যাইবে।"

পুত্রকে কোলে করিয়া রাণী সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

# একাদশ পরিচ্ছেদ।

## দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ।

চন্দ্রকেতু ভুবনেশ্বরীর নিকট বিদায় লইয়া, প্রাঙ্গনে আসিলেন। সৈন্যগণ তথায় তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি উপ-

স্থিত হইলে, সকলে তাঁহার জয়ধ্বনি করিল। দুর্গদ্বার উন্মোচন হইল, চন্দ্রকেতু অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার সৈন্যগণ 'কালী কালী' রবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রণক্ষেত্রে ছুটিল। পশ্চাতে দুর্গদ্বার অবরুদ্ধ হইল।

পূর্ব্ব দিনের যুদ্ধে যবনের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। হিন্দুর গৌরবে গোরাচাঁদ অস্থির হইয়াছিলেন। যদিও হিন্দু তাহাদের সেনাপতিহীন হইয়াছিল, তথাপি তাহারা রণে ভঙ্গ না দিয়া যেরূপ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই বিক্রম দেখিয়া মোগল সেনাপতির অন্তর হইতে জয়াশা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল। রোষে, ক্ষোভে, সেই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া মোগল সেনাপতি, চন্দ্রকেতুকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত সমরে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার প্রধান সহায় ও বল এখন দুইটা কামান মাত্র। তাহাই লইয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

হিন্দুসৈন্য 'কালী কালী' রবে ছুটিতেছে, তাহাদের হস্তস্থিত নিষ্কোষিত শাণিত তরবারি সূর্য্য-কিরণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, তাহারা যবন-বিনাশের জন্য উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছিল।

যবন শত্রুসৈন্য সম্মুখীন হইল, তখন মুসলমানের কামান অগ্নি উদ্গীরণ করিল। সেই অনলে কত হিন্দু সৈন্য তিরোধান হইল। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে ভীত হইল না, টলিল না, অটল অচলভাবে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। মোগলের কামানের বিশ্রাম নাই, অবিরত গভীর গর্জ্জনে ভীষণ অনল-রাশি উদ্গীরণ করিয়া তাহাদের পুড়াইতে লাগিল। বিনাযুদ্ধে হিন্দুসৈন্য পেষিত হইতে লাগিল।

চন্দ্রকেতু দেখিলেন বিষম বিভ্রাট, বিনা যুদ্ধে সৈন্য নিহত

হইতেছে, তিনি একটু চিন্তা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"ঐ যে কামান, যাহাতে আমাদের দগ্ধ করিতেছে, এস আমরা উহা দখল করিয়া লই। উহা দ্বারাই যবন বিনাশ করা যাউক।"

এই বলিয়া তিনি সেই অগ্নিবৃষ্টিমুখে অশ্ব ছুটাইলেন, প্রভু-ভক্ত সৈন্যেরাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

চন্দ্রকেতুর অভিপ্রায় মোগলসেনাপতি বুঝিতে পারিলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ কামান রক্ষার জন্য অনুমতি দিলেন। সমস্ত মোগলসৈন্য কামান রক্ষার্থে অগ্রসর হইল।

চন্দ্রকেতুকে মোগলসেনাপতি এই প্রথম দেখিলেন। তাঁহার রূপ গুণের কথা শুনিয়াছিলেন, এখন নিজ চক্ষে দেখিয়া তাঁহার মনের প্রত্যয় জন্মিল। বাহুবলের পরীক্ষা পরে হইবে, এক্ষণে তাঁহার অতুল রূপরাশি দেখিয়া তিনি কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার বীরত্বের আভাও পাইলেন এবং মনে মনে বিজয়লালের বাক্য স্মরণ করিলেন। ভাবিলেন—চন্দ্রকেতু যথার্থই সুপুরুষ ও বীরত্ব গৌরবে গৌরবান্বিত। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে-ছেন, এমন সময় সেই অগ্নিবৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া চন্দ্রকেতুর বাহিনী আসিয়া যবনের উপর পড়িল। পরস্পরের অসি সংঘর্ষণে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল, দুই পক্ষে মহা সমর বাধিল।

প্রাতঃকাল হইতে দুইপ্রহর পর্য্যন্ত সমর হইল; কিন্তু কোনও পক্ষ জয়ী হইতে পারিল না। উভয় পক্ষের অসংখ্য সৈন্য মরিতেছে, শবে শবে রাশিকৃত হইয়াছে, সেই শবের উপর দাঁড়াইয়া উভয় দলে অসিচালনা করিতেছে। ক্রমে

যবনগণ বলহীন হইতে লাগিল। চন্দ্রকেতু বিজয়ী হয়েন, এমন সময়ে বিপক্ষ-পক্ষ হইতে শত শত তীক্ষ্ণ শর আসিয়া তাঁহার সৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল। গলায়, মস্তকে, বক্ষঃস্থলে, বাহুতে বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ধরাশায়ী করিতে লাগিল। তাঁহার নিজের বক্ষঃস্থলেও দুই চারিটা শর আসিয়া পড়িল, কিন্তু তাঁহার দেহ বর্ম্মাবৃত থাকায়, তাহাতে ঠেকিয়া উখড়িয়া পড়িল।

এইরূপ অন্যায় সমরে সৈন্য নিহত দেখিয়া চন্দ্রকেতুর নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি রোষকষায়িতলোচনে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; দেখিলেন,—অতি দূরে একটী বৃক্ষতলায় দাঁড়াইয়া দুই ব্যক্তি শর নিক্ষেপ করিতেছে। তিনি নিজ ধনুকে শর যোজনা করিলেন, অব্যর্থসন্ধানে দূরস্থিত দুই জন ধানুকীর জীবনহীন দেহ ভূতলে পতিত হইল। যবন পক্ষের শরনিক্ষেপ থামিল, কিন্তু তাঁহার শরবৃষ্টি থামিল না। পলকে শত শত শর ছুটিতে লাগিল, প্রতি আঘাতে যবন ধরাশায়ী হইতে লাগিল। শরে শরে রণস্থল অন্ধকার প্রায় হইল; যবন প্রমাদ গণিল। মোগলসেনাপতি চন্দ্রকেতুর শিক্ষার প্রশংসা অন্তরে অন্তরে করিলেন এবং নিজ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, চন্দ্রকেতুর বিজয়লালের নিধন কথা মনে পড়িল, তাঁহার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল, তিনি ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া অসি নিষ্কোষিত করিলেন। যবনসেনাপতি নিকটে আসিলে তাঁহাকে কহিলেন,—

"অন্যায় সমরে আমার সেনাপতিকে নিধন করিয়া যে

আগুন আমার হৃদয়ে জ্বলিয়াছে; তাহার প্রতিশোধ আজ আমার হস্তে পাইবে। যে আশায় দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছ, আজ তাহার শেষ হইবে; দিল্লীতে সংবাদ দিবার নিমিত্ত একটী প্রাণীও থাকিবে না।"

উভয়ে যুদ্ধ বাধিল। চন্দ্রকেতু সুশিক্ষিত, কিন্তু সেনাপতিও অশিক্ষিত নহে, স্বল্প সময়ে তিনি তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না; উভয়ে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল। চন্দ্রকেতুর যবনসেনাপতি উভয়ের দেহই ক্ষতবিক্ষত হইল, আহতস্থান হইতে প্রবল বেগে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার দেহ বলহীন হইল, চন্দ্রকেতুর পুনরাঘাতে তাঁহার ছিন্ন শির ভূমিতে পড়িল; হিন্দু জয়ধ্বনি করিল। যবন পশ্চাৎ ফিরিল। যুদ্ধে প্রায় সমস্ত বিপক্ষ নষ্ট হইয়াছিল, অবশিষ্ট যাহা দুই চারিজন ছিল, সেনাপতির নিধনে তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল; তাহাদিগকে পলাইতে দেখিয়া চন্দ্রকেতু নিজ সৈন্যগণকে তাহাদিগের পশ্চাদ্গমন করিতে আদেশ দিলেন। হতভাগোরা অধিক দূর যাইতে না যাইতে হিন্দুদ্বারা সমূলে নিধন হইল।

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

## প্রতিশোধ।

যখন চন্দ্রকেতু যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন, তখন গোরাচাঁদ কোথায় ? তাঁহার সকল আশা ব্যর্থ হইল, নিরাশার যাতনায় তিনি ব্যাকুল হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন, পার্শ্বস্থিত একটি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভাবনা,—কি প্রকারে চন্দ্রকেতুকে বিনষ্ট করেন ! তাঁহার নিজের ক্ষমতা নাই, দেশে সেরূপ ক্ষমতাপন্ন লোকও নাই যে, প্রতাপশালী চন্দ্রকেতুর বিপক্ষে উত্থিত হয়। মহা প্রতাপশালী সম্রাটের সৈন্য তৃণের ন্যায় ভস্ম হইল, তখন আর কে তাঁহার বিপক্ষে উঠিবে ? আবার কি দিল্লী যাইব ? সেও ত বড় সহজ ব্যাপার নয় ! তিন মাসের কম সম্রাটের সৈন্য এখানে আসিতে পারিবে না। তত দিনে চন্দ্রকেতু আবার নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিবে, তাহাদিগকে রণ-কুশল করিবে, আর যদি সম্রাট্ সৈন্য না দেন, তুচ্ছ একটা রাজ্যের জন্য তাহার কত সৈন্য নষ্ট হইল। তিনি হয় ত আর সৈন্য দিবেন না। তাই ত, তবে কি হবে ? আমার বাসনা কি পূর্ণ হবে না ? ঈশ্বর ! আমার প্রতিহিংসার কি পরিশোধ হইবে না ?”

গোরাচাঁদের নয়নে জল আসিল, তিনি অধোমুখে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার কি স্মরণ হইল,

তাঁহার নয়নের জল শুখাইল, বর্ষার ধারা অন্তে প্রকাশিত তপনের ন্যায় নয়ন-যুগল জলিয়া উঠিল; তিনি উঠিলেন।

সমরান্তে বিজয়ী চন্দ্রকেতু যে বৃক্ষমূলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

চন্দ্রকেতু বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, পার্শ্বে পিঞ্জরাবদ্ধ পারাবত দুইটি রহিয়াছে; গোরাচাঁদ পশ্চাদ্দিগ হইতে নিঃশব্দে সেই পিঞ্জরের দরজা খুলিয়া দিলেন। মুক্তপথে বিহঙ্গম দুইটি উড়িয়া প্রস্থান করিল—গোরাচাঁদ আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। অকস্মাৎ তাহাকে দেখিয়া চন্দ্রকেতুর মনে সন্দেহ হইল, তিনি ভাবিলেন—"যবন আবার কি দুরভিসন্ধিতে উপস্থিত হইল।"

গোরাচাঁদ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, অন্তরে হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন,—

"চন্দ্রকেতু, আর তোমার সহিত আমার বিবাদ নাই; এস তোমায় আমায় মিত্রতা করি।"

চন্দ্রকেতু বিকটহাস্যে উত্তর করিলেন,—"মিত্রতা!—তুমি যবন বিধর্ম্মী, আমার পরম শত্রু তুমি! তোমার সহিত মিত্রতা? —দিল্লী হইতে সৈন্য আনিয়াছিলে আমার নিধন করিতে এখন সে আশা মিটিয়াছে, তাই মিত্রতার আশা হইয়াছে। তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?—আমি মিত্রতা করিবার নিমিত্ত তোমায় অনেক খুঁজিয়াছিলাম,—এমন যদি আসিয়াছ, এস তবে মিত্রতার কার্য্য সম্পন্ন করি। কিন্তু তোমার আমার নয়?—তোমাতে আর আমার এই অসিতে আজ মিত্রতা হইবে?—যে অনল নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছিল, তোমার ফুৎকারে আবার তাহা

দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই প্রজ্বলিত অনলে বঙ্গদেশে যবন-শূন্য হইবে;—কিন্তু সে পরে;—আজ তোমাকে নিধন করিয়া সেই অনলে আহুতি প্রদান করিব। নরাধম! আজ আর তোর নিস্তার নাই।"

চন্দ্রকেতু উঠিলেন, কোষ হইতে অসি উন্মোচন করিয়া গোরাচাঁদকে প্রহার করিতে যাইবেন, অমনি তাহার দৃষ্টি সেই শূন্যপিঞ্জরে নিপতিত হইল। পিঞ্জর শূন্য,—তাহার দরজা উন্মুক্ত, তাহাতে যে জীব দুটি ছিল, তাহা যে কখন উড়িয়া গিয়াছে, তিনি তাহার কিছুই জানেন না। শূন্য পিঞ্জর দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, তাহার দেহ যেন অবশ হইল, তিনি আরক্ত-নয়নে গোরাচাঁদের প্রতি চাহিলেন, দেখিলেন, তাহার নয়নে কপটতা খেলা করিতেছে। তিনি কহিলেন—

"সামর্থ্যে যাহা করিতে না পারিয়াছিলে. শঠতায় তাহা সিদ্ধ হইল! যদি গৃহে গিয়া সমস্ত মঙ্গল দেখিতে পাই, তবে ফিরিয়া আসিয়া তোমার এ কর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করিব;—নতুবা, এ পর্য্যন্ত তোমায় আমায় সম্বন্ধ ফুরা'ল।"

তিনি শূন্যপানে চাহিলেন, দেখিলেন অতিদূরে উধাও হইয়া পারাবত দুইটি উড়িয়া যাইতেছে। তিনি লম্ফ দিয়া অশ্বারোহণ করিলেন; অশ্ব তীরবেগে প্রাসাদাভিমুখে ছুটিল।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

## রাজ-রাণী।

রাজ-প্রাসাদের প্রাঙ্গণে ভীষণ চিতা জলিতেছে। সেই চিতার অনল-শিখা প্রাসাদের উন্নত ছাদ অতিক্রম করিয়া আকাশপানে ছুটিয়াছে। তাহার পার্শ্বে রাজ-রাণী ভুবনেশ্বরী পুত্রটিকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—পার্শ্বে ধাত্রী নীরবে দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

ভুবনেশ্বরীর পরিধানে পট্টবস্ত্র, অঙ্গে কোনও আভরণ নাই, নয়ন জল দরদর ধারে বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করিতেছে। তিনি এক একবার প্রসাদ-শিখরে দেখিতেছেন,আর দেখিতেছেন বক্ষঃস্থিত অমূল্য রত্ন। হৃদয়ধনের সেই মুখারবিন্দ অনিমিষ লোচন দেখিতে-ছেন—সেই নির্ম্মল প্রফুল্ল বদন-কমলে চুম্বন করিতেছেন; নয়ন জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। চক্ষের জলে দৃষ্টিরোধ হইতেছে, তাহা অঞ্চলে মুছিয়া আবার সেই মুখখানি দেখিতেছেন। আজ জন্মের মতন তাহাকে ছাড়িতে হইবে, আর কখনও তাহাকে দেখিতে পাইবেন না, আর কোলে করিয়া তাহার সেই চাঁদমুখে চুম্বন করিতে পারিবেন না, আর এ জন্মে তাহার সেই মধুমাখা আধ-আধ স্বরে "মা"—বলা শুনিতে পাইবেন না, আজ তাহা জন্মের মত ফুরাইবে! মায়ের প্রাণ,—সন্তান একটু চক্ষের অন্তরাল হইলে কাঁদিয়া উঠে, হৃদয়ে কত ভাবনা হয়,

কিন্তু তিনি আর জন্মের মত তাহাকে দেখিতে পাইবেন না। তিনি আজ তাই তাহাকে ছাড়িতে পারিতেছেন না, আজ তাহাকে চক্ষের অন্তর করিতে তাহার যেন বুক ফাটিয়া যাইতেছে; তিনি তাই তাহাকে বক্ষে করিয়া, তাহার মুখ চুম্বন করিয়া তাহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইতেছেন, জন্মের মত হৃদয়ের সাধ মিটাইয়া লইতেছেন।

চিতা জ্বলিতেছে, ধূ ধূ জ্বলিতেছে। অনল তাহার সর্ব্ব-সংহারিণী মূর্ত্তি দখিবার জন্যই যেন আজ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। আজ সেই সতীর কমনীয় কান্তি দগ্ধ করিবার জন্য তাহার সহস্র জিহ্বা যেন লক্ লক্ করিতেছে! কিম্বা সতীঅঙ্গ নিজ দেহে ধারণ করিয়া তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্যই যেন ডাকিতেছে,—এস সতি!—এস মা,—আমার অঙ্গে তোমার পবিত্র চরণ প্রদান করিয়া আমার 'অনল' নাম সার্থক কর। আমি তোমায় শান্তি দান করিব। আমাতে মিশিলে, তোমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে; তোমার যশ ভুবনে ঘোষিত হইবে! কে বলে অনলে শান্তি নাই? যে বলে সে কিছুই জানে না! আমাতে মিশিলে জীবের জীবত্ব লোপ হয়, সে পরম জীবন লাভ করে;—তাহার রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ, চিন্তা কিছুই থাকে না; হিংসা দ্বেষ লোপ পায়, মায়াজাল ছিন্ন হয়, আমার পরশে অপবিত্র জীবগণ পবিত্র দেহ ধারণ করে। এস মা—তোমাকে পবিত্র করি। তোমাকে পবিত্র করিয়া আমি পবিত্র হই।"

পারাবত দুইটি উড়িয়া আসিয়া প্রাসাদে বসিল, ভুবনেশ্বরী তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর তিনি ধাত্রীকে কহিলেন,—"ধাত্রি! ধর মা, আমার জীবনধনকে ধর, আমার সময় ফুরাইয়াছে, ঐ দেখ আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে! আমার সুশীলকে তুমি ধর, আমি বাছাকে তোমার কাছে রাখিয়া চলিলাম, এখন তুমি ইহার মা, তুমি ইহাকে যত্ন করিও, নিজের সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিও। দেখ মা, আমার বাছা যেন কষ্ট কোনও পায় না, বড় সাধ মনে ছিল, বিধাতা সে সাধে বাদ সাধিলেন। মনের আশা মনেই রহিয়া গেল! আর আমি অধিক তোমাকে কি বলিব।"

আর অধিক কিছু বলিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। তাঁহার বুক ফাটিতেছে, অন্তর-যাতনায় হৃদয় আকুল হইতেছে, মনের কথা মুখে ফুটিতেছে না, তিনি ধাত্রীর কোলে সুশীলকে দিতে যাইবেন, এমন সময় দরজায় আঘাত হইল। তিনি চকিত নেত্রে চারিদিকে চাহিলেন। ভাবিলেন—বুঝি যবন আসিয়া দরজা ভাঙ্গিতেছে,—ম্লেচ্ছ হিন্দুর আবাসে প্রবেশ করিতেছে, নিঃসহায় অবলাকে কে রক্ষা করিবে? যিনি রাখিবেন, যাঁর শান্তিময় বক্ষঃস্থলে অভাগিনী শান্ত হইবে, তিনি ত চলিয়া গিয়াছেন; তখন এ বিপদে কে উদ্ধার করিবে? এখন অনাথের সহায়, দুর্ব্বলের বল, একজন সেই ঈশ্বর! পরমেশ্বর! এই অভাগিনীকে তোমার অভয় চরণে স্থান দাও অবলা রমণীর অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষা কর।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি ত্বরিত হস্তে অবশিষ্ট কাষ্ঠরাশি চিতায় নিক্ষেপ করিলেন, কলসী পূর্ণ ঘৃত তাহাতে ঢালিয়া দিলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ অনল আবার ভীষণরূপে জলিয়া

উঠিল। আবার সেই শব্দ, পুনঃ পুনঃ ভীষণ আঘাতে দরজা ভগ্নপ্রায় হইল, তাহার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, জাতি, মান রক্ষার নিমিত্ত তিনি ব্যস্ত হইলেন, সুশীলকে ধাত্রীর কোলে দিবার নিমিত্ত বক্ষঃস্থল হইতে সরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল। সুশীল ছাড়িল না, যেন জননীর আসন্ন মৃত্যু জানিয়া সে তাহাকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিল, যেন তাহাকে যাইতে দিবে না, ভুবনেশ্বরী অস্থির হইলেন। সুশীল কোল হইতে যাইতে চায় না। এদিকে শত্রুর আঘাতে দরজা ভগ্নপ্রায় হইল, খিলান হইতে ইট খসিয়া পড়িতে লাগিল, আর বিলম্ব নাই, এখনি দরজা ভগ্ন হইবে,—এখনি যবন পুরে প্রবেশ করিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিবে। চন্দ্রকেতুর মহিষীকে যবনে দেখিবে? ধিক্ জীবনে, ছার সন্তানের মায়া? সতীত্ব অপেক্ষা মূল্যবান্ কি? তিনি আর কোনও দিকে চাহিলেন না, সুশীলকে কোলে করিয়াই সেই জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিলেন। অনল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল, নিমেষ মধ্যেই সেই কমনীয় কান্তি পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইল!

ভীম আঘাতে দরজার অর্গল ভগ্ন হইল, অশ্বারোহণে চন্দ্রকেতু পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই শ্মশানের দৃশ্য দেখিলেন, ধাত্রীর মুখে সপুত্র ভুবনেশ্বরীর নিধনবার্ত্তা শুনিলেন। তিনি উন্মাদের ন্যায় সেই চিতায় লম্ফ প্রদান করিলেন। কিন্তু একি? সে চিতা নাই, সে অনল রাশি নাই,—সেই প্রশস্ত প্রাঙ্গন গভীর জলাশয় হইয়াছে—পাতাল ভেদ করিয়া ঘূর্ণায়মান বারিরাশি প্রবল বেগে ঊর্দ্ধপথে প্রধাবিত হইতেছে। চন্দ্রকেতু সেই জলমধ্যে নিপতিত হইয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য

হইলেন, একবার মাত্র সেই গভীর জলরাশি উছলিয়া উঠিল, পরক্ষণেই নিস্তব্ধতা হইল।

ধাত্রী একটী প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই সকল দৃশ্য তাহার চক্ষে যেন ইন্দ্রজালিক ক্রীড়া বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভয়ে তাহার বুক শুখাইয়া গিয়াছে, অঙ্গ কাঁপিতেছে, কিন্তু পলাইবার উপায় নাই। একমাত্র সিংহ দরজা, তাহা চন্দ্রকেতুর সেই ঘূর্ণিত বারিতে ঝাঁপ দিবার সঙ্গে সঙ্গে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। কে সে দরজা দিল? আর ত এক প্রাণীও সেখানে ছিল না? ধাত্রীর এ সকল যেন ভৌতিক কাণ্ড বিবেচনা হইতে লাগিল. তাহার হৃদয় আরও কাঁপিতে লাগিল। সে নিরুপায়ে সেইখানে দাঁড়াইয়া উপায় চিন্তা করিতেছে, নয়নে অবিরল জলধারা পড়িতেছে; সে জল, রাজরাণী অথবা সুশীলের শোকে নয়;—তাহার নিজের বিপদের জন্য।

সে ভাবিল—"সকলে পলাইল, আমি পোড়ামুখী কেন থাকিলাম! ভাবিয়াছিলাম যে, রাজা ও রাণী মরিলে সুশীলকে আমার কাছে দিয়া যা'বে, আর এই রাজার ধন দৌলত আমার হইবে; আমি রাণীর ন্যায় কাটাইতে পারিব। এই আশায়—এই ধনের লোভে আমার সর্ব্বনাশ হইল, ধন ত পাইলাম না, এখন প্রাণ বাঁচাইবার উপায় কি?—এই পুরী শ্মশানের ন্যায় হইয়াছে—যেন খাঁ খাঁ করিতেছে, এখানে থাকিলে ত ভূতে মারিয়া ফেলিবে?"—ভূত!—ধাত্রীর আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত বিভীষিকা দেখিতে পাইল, যেন তাহার চতুর্দ্দিকে ভূত নাচিয়া বেড়াইতেছে, যেন জীবন্ত নরমাংস খাইতেছে, তাহাদের সেই বিকট আকার ধাত্রী যেন

দেখিতে পাইল। তাহারা যেন তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে! ভয়ে ধাত্রী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, শূন্য অট্টালিকায় সেই বিকট রবের প্রতিধ্বনি হইল।—সে ধ্বনি ধাত্রী শুনিতে পাইল, পিশাচের রব ভাবিয়া সে ভয়ে মূর্চ্ছিত হইল।

অনেকক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান হইল, সে নয়ন মেলিল, চারিদিকে চাহিল, দেখিল কেহ কোথাও নাই; সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল—ছাদের উপর যাইয়া চীৎকার করি, অবশ্য কেহ না কেহ আমার উদ্ধার করিবে, কিন্তু যদি যবন থাকে, তবে ত গুলি করিয়া আমাকে মারিবে। যে দিকে যাই, আমার মৃত্যু নিশ্চয়, ভুতের হাতে মরার চেয়ে, মানুষের হাতে মরি সেও ভাল, তবু আমি ছাদে যাইব।

এই ভাবিয়া সে ছাদে যাইবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল. কেবল দুই কি তিন পদমাত্র গিয়াছে, এমন সময়ে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া সে দাঁড়াইল।

ধাত্রী দেখিল,--প্রাঙ্গণের সেই ঘূর্ণিত বৃহৎ জলাশয় হইতে একখানি রথের ন্যায় কি উঠিতেছে। ক্রমে তাহা উপরে উঠিল, সে দেখিল, তাহা বাস্তবিক রথই বটে। রথ ক্রমে উপরে উঠিল, ধাত্রী বিস্ময়ে দেখিল,—রথ শ্বেতবর্ণ, তাহা পারিজাত কুসুমদামে সুসজ্জিত, তাহার জ্যোতিতে বিজলী ঝরিতেছে। সেই রথে চন্দ্রকেতু—বামে ভুবনেশ্বরী,কোলে সুশীল। তাঁহাদের অঙ্গে বিবিধ ভূষণ, গলায় পারিজাত-মালা, দুইপার্শ্বে দুইজন অপ্সরা দাঁড়াইয়া চামর ব্যজন করিতেছে! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!!

রথ ক্রমে উর্দ্ধে উঠিল, প্রাসাদের ছাদ অতিক্রম করিল,

তার পর আর দেখা গেল না; শূন্যে উঠিয়া শূন্যে মিশাইয়া গেল।

ধাত্রী আর উপরে উঠিল না, সে সেই জলাশয়ের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল নীচের জল যেন ফুটিতেছে, আর একবার উপরে দেখিল, রথের কোনও নিদর্শন পাইল না। সে সেই ঘূর্ণিত জলে ঝাঁপ দিল। রাজ-প্রাসাদে বাতি দিতে আর কেহই রহিল না।

---

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

## অনুতাপ।

চন্দ্রকেতুকে স্ববংশে নিধন করিয়া গোরাচাঁদ নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় বড়ই কাতর হইল। ঘোর বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া কতকগুলি প্রাণীহনন হেতু হওয়ায় তাঁহার অন্তরে অতিশয় আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁহারই অপরাধে বিনা দোষে চন্দ্রকেতু কর্ত্তৃক যবন-বধ, তাঁহারই উত্তেজনায় হিন্দু মুসলমানে সমর, তাহাতে কত প্রাণী নষ্ট হইল। আবার তাঁহারই শঠতায় চন্দ্রকেতুর মহিষী রাজরাণী ভুবনেশ্বরী ও বালক রাজকুমার সুশীলের অকাল মৃত্যু, প্রজ্বলিত অনলে আত্ম-বিসর্জ্জন!—সোণার সংসার কেবল তাহারই অপরাধে শ্মশানে পরিণত হইল!

গোরাচাঁদ ব্যাকুল হইলেন, দারুণ অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দহিতে লাগিল—কর্ত্তব্যজ্ঞান, বৃশ্চিকের ন্যায় তাহাকে দংশন করিতে লাগিল।

তাঁহার হৃদয় যাতনায় অস্থির হইল,—মমতায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল,—কিন্তু সে মমতা এখন বিফল, সে কর্ত্তব্যজ্ঞান বৃথা। এই চিন্তা—এই জ্ঞান—এই মমতা যদি পূর্ব্বে হইত, তবে কতই সুখের হইত; কিন্তু তাহা হয় নাই—দারুণ বিদ্বেষে ভয়ানক প্রতিহিংসার উত্তেজনায় তিনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, এখন তাহার অনুতাপে কি ফল?

আর ত চন্দ্রকেতু ফিরিবে না?—আর ত সেই চন্দ্রকেতুর বংশধর রাজকুমার সুশীল ফিরিয়া আসিবে না? তাহারা এ জগতে নাই; তাহারা এখন সেই অনন্তধামে—যেখানে চির-সুখ—যেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান, যেখানে পাপ, দ্বেষ, হিংসা ও বাসনা কিছুই নাই, কাহারও অত্যাচার নাই, যেখানে সকলেই প্রেমময়, সেইখানে তাহারা গিয়াছেন, আর ত ফিরিবেন না, কর্ম্ম-ফল ভিন্ন সে স্থান হইতে কেহ চ্যুত হয় না।

গোরাচাঁদ ভাবিলেন,—"আমি কি করিতে আসিয়াছিলাম, কি করিলাম, কি বলিয়া এ কথার উত্তর প্রদান করিব? কিরূপে আমার এই কলুষরাশি ঢাকা দিব? জগতের প্রাণীমাত্রেই আমাকে ঘৃণা করিবে,—ইতিহাস অনল অক্ষরে আমার এই দুষ্কর্ম্মের কথা প্রচার করিবে? হায়!—হায়! আমি কি দুষ্কর্ম্মই করিলাম!"

ধার্ম্মিকের হৃদয়ে ধর্ম্মের আঘাত লাগিল,—মর্ম্মে মর্ম্মে সেই দারুণ ব্যথা প্রথিত হইল। তিনি বিচলিত মনে কুটীর হইতে বাহির হইলেন। তখন রজনী গভীরা,—আকাশ ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, প্রবলবেগে বারি বরিষণ হইতেছিল। বিকট বজ্রনাদ অনন্ত জগতে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

গোরাচাঁদ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তিনি সেই বৃষ্টিধারা তুচ্ছ করিয়া, সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়া, চন্দ্রকেতুর প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে তিনি প্রাসাদ-তোরণে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে বৃহৎ লৌহ কপাট তাহার নয়নগোচর হইল, তাহা অবরুদ্ধ; কিন্তু তিনি হস্তার্পণ করিবামাত্রেই ঝন্‌ঝন্ শব্দে তাহা খুলিয়া গেল, তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

প্রাঙ্গণের সেই আবর্ত্তের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি দেখিলেন, বিশাল রাজ-ভবন নিস্তব্ধ. কক্ষদ্বার সমস্ত উন্মুক্ত, একটীমাত্র জীবিত প্রাণী তাহার ভিতর আছে বলিয়া তাহার অনুভূত হইল না, কেবল শূন্যকক্ষপ্রবিষ্ট প্রচণ্ড বায়ুরাশির ভয়াবহ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সেই ঘোর অমানিশায়—সেই ভীষণ শ্মশানে দাঁড়াইয়া তিনি সেই শূন্য প্রাসাদের ভীষণ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। একে একে সমস্ত কক্ষ পর্য্যটন করিয়া দেখিলেন,—ধনরত্ন-মণি মুক্তা, অপরাপর গৃহসামগ্রী যথাস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে, একটী তৃণমাত্র নষ্ট হয় নাই। সমস্ত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—খেদে নয়ন হইতে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন—"হায়! এই রত্নরাশি, এই বৃহৎ রাজভবন, কে ভোগ করিবে?—কেহই নাই। এই বিশাল পুরীতে সন্ধ্যা দিবার নিমিত্ত একটী প্রাণীও নাই!—এখন এই সমস্ত ধনরত্ন যে পাইবে, সেই লইয়া যাইবে,—যে ইচ্ছা করিবে, সে এই ভবন অধিকার অথবা ইহার ইষ্টকাদি লইয়া যাইবে। না—না তা হইবে না! মহারাজ চন্দ্রকেতুর অতুল ঐশ্বর্য্য এরূপে নষ্ট হইবে না! যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার উপায় নাই—এখন চন্দ্রকেতুর নাম যাহাতে লোপ না হয়, সেই চেষ্টা আমার করিতে হইবে, তাহার ধনরত্ন যাহাতে অপরে লইতে না পারে, তাহার উপায় আমায় করিতে হইবে, আর সেই লক্ষ্মীস্বরূপা পতিব্রতা সতী সাধ্বী রাজরাণী ভুবনেশ্বরীর

অক্ষয় স্মরণচিহ্ন আমায় রাখিতে হইবে; নতুবা, আমার এই পাপের নিস্তার নাই।

উঃ!—সতী,—সতী.—মা! আমায় অভিশাপ দিও না, মা! মাগো! কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইয়া যে কুকর্ম্ম আমি করিয়াছি, তোমার কোমল প্রাণে—সরল অন্তরে—কত ব্যথা আমি দিয়াছি! মা সতীলক্ষ্মী, এ অধমের সেই অপরাধে অভিশাপ দিয়া পতিত ক'র না মা! মা'গো! এ দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত আমি করিব। দেশে দেশে—বাড়ী বাড়ী তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিব। তোমার কীর্ত্তন করিব. তোমার পতিভক্তির কথা প্রচার করিয়া বেড়াইব, তোমার নামে ভিক্ষা করিয়া আমার এ ছার—এ পাপ উদরান্নের সংস্থান করিব, অদ্য হইতে এই আমার ব্রত। এই ব্রত পালন করিয়া হিন্দুর উপকারে আমার জীবন অতিবাহিত করিব।

অনুতপ্ত গোরাচাঁদ কাতরহৃদয়ে করযোড়ে ভুবনেশ্বরীকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। পরে, শোকসন্তপ্তহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণনয়নে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

---

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

---

## সিদ্ধ-গোরাচাঁদ।

চন্দ্রকেতুর বংশের অনেকপরে গোরাচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে; তাহা না লিখিলে তাহার জীবনের শেষাংশ পূর্ণ হয় না বলিয়া লিখিত হইল। পূর্ব্ব ঘটনার পর হইতে গোরাচাদ পরের উপকারার্থে জীবন উৎসর্গ করিলেন। দেশে দেশে—বাড়ী বাড়ী ভুবনেশ্বরীর গুণকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার সেই অনুতাপে সহানুভূতি প্রকাশ করিল না। চন্দ্রকেতুর নিধনের পর হইতে তাঁহাকে দেখিলেই লোকে ভীত হইত. ঈর্ষার নয়নে তাঁহাকে দেখিত, কেহ কেহ বা উপহাসও করিত। কিন্তু, তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, তিনি সাদরে সেই উপহাস

ও ভাচ্ছিল্যাভূষণ অঙ্গে ধারণ করিয়া লোকের উপকারার্থে প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন।

একদিন রজনীতে তিনি আশ্রয়-প্রত্যাশায় এক কৃষকের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, কৃষক সাদরে তাঁহাকে আশ্রয় দিল ও যথাসাধ্য আহারাদি প্রদান করিল। পরে উত্তমরূপে শয্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে শয়ন করিতে দিল। তাঁহারা উভয়ে শয়ন করিলেন এবং অচিরেই নিদ্রিত হইলেন। হঠাৎ ক্রন্দনের শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন, দেখিলেন, কৃষক প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার স্ত্রী তাহার দুই পা ধরিয়া কাঁদিতেছে, আর বলিতেছে—

"না, না—তুমি যাইও না! তুমি যাইলে, আমি কি করিয়া থাকিব, কে আমার ভরণ পোষণ করিবে, অনাথা পতিহীনা রমণীর জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। তুমি থাক, তুমি বাঁচিয়া থাকিলে আবার রমণী পাইবে, আবার তোমার সংসার হইবে, আবার তুমি সুখী হইতে পারিবে; কিন্তু আমি থাকিলে কিছুই হইবে না, কেবল আমার দেহ বহন করিয়া আজীবন জ্বলিতে হইবে; তাই বলিতেছি নাথ! তুমি যাইও না,—তুমি গৃহে থাক, আমি যাই।"

কৃষক কহিল—"না তা হইতে পারে না, আমি পুরুষ মানুষ, আমি গৃহে বসিয়া থাকিব, আর আমার স্ত্রী মরিতে যাইবে, আমি তাহা দেখিব, আমার প্রাণ থাকিতে তাহা হইবে না। আমিই মরিব, আমি থাকিতে কখনও তোমায় মরিতে দিতে পারিব না; আমি চলিলাম, তুমি গৃহে যাও।

কৃষক যাইবে, কিন্তু রমণী ছাড়িবে না। গোরাচাঁদ এইমাত্র দেখিলেন ও শুনিলেন; কিন্তু ভিতরের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তিনি কৃষককে ডাকিয়া কহিলেন—"তোমরা অমন করিতেছ কেন? তোমাদের কথা কি আমায় ভাঙ্গিয়া বল।"

তখন কৃষক ও তাহার পত্নী গোরাচাঁদের নিকট আসিয়া বসিল, বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

"আগে আমাদের এখানে বড় রাক্ষসের ভয় ছিল, প্রত্যহ

অনেক মানুষ ধরিয়া খাইত ও লইয়া যাইত; তাই গ্রামের লোকে তাহার পায়ে হাতে ধরিয়া অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া বন্দোবস্ত করিয়াছে—প্রতিবৎসর একজন করিয়া তাহার আহারার্থে প্রদান করিবে। সে তাহাতে স্বীকৃত হইল এবং সেই পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর এক এক বাড়ী হইতে একজন করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়। আজ সেই রাক্ষসের আসিবার দিন, এবার আমাদের পালা পড়িয়াছে; তাই আমি যাইতেছি, আমার স্ত্রী ছাড়িতেছে না। আপনি ভদ্রলোক বিচার করিয়া বলুন দেখি কাহার যাওয়া উচিত?"

গোরাচাঁদ আশ্চর্য্যের সহিত এই কথা শুনিলেন, তাঁহার অন্তরে হঠাৎ কি উদয় হইল; তিনি কহিলেন—"আমি একটা কথা বলি, শুনিবে কি?"

কৃষক কহিল, "কি, বলুন।"

গোরাচাঁদ তখন তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া আপনি যাইতে চাহিলেন। কৃষক স্বীকৃত হইল না; অতিথিকে কিরূপে রাক্ষসের হাতে সঁপিয়া দিবে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। গোরাচাঁদ তখন নিজের পরিচয় দিলেন এবং কৃষককে আশ্বস্ত করিয়া শিষ্য সহ সেইখানে উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে রাক্ষস আসিল, তাহার সহিত গোরাচাঁদের ভয়ানক যুদ্ধ হইল, পরের দিন যুদ্ধের পর রাক্ষস নিধন হইল; কিন্তু গোরাচাঁদ সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইলেন। সেই আঘাত হইতে তিনি আর আরোগ্য হইতে পারিলেন না, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এইরূপ আছে যে, ইটের গুঁড়া ও পানের রস পাইলে তিনি নাকি আরোগ্য হইতে পারিতেন, কিন্তু সে দেশে পান ও ইট পাইলেন না। তিনি মৃত্যুকালে এই অভিশাপ দিয়া গিয়াছিলেন যে, "এই অঞ্চলে (বালণ্ডা পরগণায়) যদি কেউ পানের বরজ আর কোটাবাড়ী করে, তবে তার বংশ থাকিবে না।" অদ্যাবধি সেই দেশে এই দুই দ্রব্য কেহই প্রস্তুত করে না। যদিও দুই একজন ইটকালয় নির্ম্মাণ করিতেছেন বটে; কিন্তু তাঁহার সঙ্গে হইতে দেখা যায় না।

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

## কৈফিয়ত।

জেলা চব্বিশ পরগণায় দেগঙ্গার থানার এলাকাধীন, দেউলিয়া হাদিপুরের মধ্যস্থলে "চন্দ্রকেতু রাজার দ"—বলিয়া একটি স্থান আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকাস্তূপ, তদুপরি বিশাল বিটপীশ্রেণীর শাখা প্রশাখায় সেই মৃত্তিকাস্তূপ ঢাকিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই মৃত্তিকা রাশির নিম্নে বৃহৎ অট্টালিকা আছে, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। একপার্শ্বে সিংহ-দরজার ন্যায় প্রকাণ্ড একটি দরজা আছে, তাহাও মৃত্তিকা, বৃক্ষরাজি ও লতাগুল্মে আবৃত। সেখানে রাত্রির কথা দূরে থাকুক, দিবাভাগেও তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে কেহ সাহস করে না। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, তাহার ভিতর যদি কেহ প্রবেশ করিতে যায়, অভ্যন্তর হইতে ভয়ানক বিষধর সকল আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, যে যায় সে আর ফিরিয়া আসে না। সেই ভয়ে অদ্যাবধি তাহার ভিতর কেহ যাইতে পারে নাই; যে, যতই চেষ্টা করুক না কেন, সমস্তই বৃথা হইয়াছে।

চন্দ্রকেতু একজন ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। উপন্যাসে যাহাই লেখা হউক, লোকের মুখে যাহাই শুনা যাউক, কিন্তু তিনি যে একজন প্রকৃত হিন্দু ও ধার্ম্মিক ছিলেন, এ কথা নিশ্চয়। শুনা যায়, পীরগোরাচাঁদের সঙ্গে বিবাদ করিয়াই তিনি সমূলে ধ্বংস হয়েন; কিন্তু কেন যে বিবাদ হইয়াছিল, কিম্বা চন্দ্রকেতু কত দিন পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কিছুই জানা যায় না, অথবা কোন ইতিহাসেও তাহার বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকের মুখেও তাহার প্রকৃত তথ্য মেলে না। কিন্তু যত দিনের ঘটনা হউক না কেন, ইহা যে মুসলমান রাজত্বের সময় ঘটিয়াছিল, তাহার কিন্তু বিশেষ প্রমাণ পাওয়া

যায়। যে ঘটনায় যাহা হইয়াছিল, তাহা উপন্যাসে লিখিত হইয়াছে, চন্দ্রকেতুর পরিচয় দেওয়া হইল, এক্ষণে আর দুইটী কথা বলিয়া পুস্তক শেষ করিব।

চন্দ্রকেতু পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময় গঙ্গাকে নিমন্ত্রণ করেন, তিনিও আসিয়াছিলেন, পথিমধ্যে গোরাচাঁদ তাহাকে কিরূপে বিদায় করিয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। এই গঙ্গা-বিদায় কথাই কাল হইয়াছিল। পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষেই আগুণ জলিয়া উঠে। শুনা যায় যে, গঙ্গা বিদায় হইবার সময় রাজপুত্রের যৌতুকার্থে কতক্ষণ স্বর্ণবৃষ্টি করিয়াছিলেন। বৃষ্টির সেই স্বর্ণরাশি রাজভবনে ও তাহার চতুর্দ্দিকে পড়িয়াছিল, তাহার চিহ্ন কিছু কিছু পাওয়া যায়। পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে, ভূমিকর্ষণ করিতে করিতে অনেকে অনেক সময় ধন রত্নাদি পাইয়াছে; এখনও কৃষকগণ দুই চারিজন একত্রিত হইয়া সেখানে চাষ করিতে যায় না—একাকী চাষ করে।

চন্দ্রকেতুর রাজত্বের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তবে সেই ধ্বংস রাজভবনের মৃত্তিকাস্তূপ দেখিয়া আসিতে পারেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। যাইবার সুবিধা—সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ের বারাশত ষ্টেশনে নামিয়া তথা হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে দেউলিয়া যাইলে দেখিতে পাইবেন—সেই মহীরুহ-বেষ্টিত মৃত্তিকাস্তূপ।

চন্দ্রকেতুর ধ্বংসের অনেক পরে, গোরাচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু পর, তাঁহার ভক্তেরা, তাঁহার নামে একটি মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মেলা প্রতিবৎসর ১২ই ফাল্গুন হাড়য়ায় হয়। অনেক দেশ হইতে লোকজন আসিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করে; ফাল্গুনের অবশিষ্ট দিন মেলা থাকে। সেই হাড়য়ায় গোরাচাঁদের কবর হইয়াছিল।

---

সমাপ্ত।